ক্রুসেড-২৫
দুর্গম পাহাড়
আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশন

ক্রুসেড - ২৫

দুর্গম পাহাড়

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ক্রুসেড - ২৫

দুর্গম পাহাড়

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর 'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ

. প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৫

প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার

মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ [illegible] ৫০.০০

CRUSADE-25

Durgom Pahar

[A heroic Adventure of the great Salahuddin]

by : Asad bin Hafiz

Published by : Pritee Prokashon

435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217

Phone : 8321758, Fax: 880-2-8321758

Published on: May 2005

PRICE : 3[illegible] 50.00

ISBN 984-581-240-6

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলেছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী। ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর শহর-গ্রামে।

একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য ও শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

আজ মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর সে স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

▼ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ▼ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান ▼ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ▼ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ▼ ভয়াল রজনী ▼ আবারো সংঘাত ▼ দুর্গ পতন ▼ ফেরাউনের গুপ্তধন ▼ উপকূলে সংঘর্ষ ▼ সর্প কেল্লার খুনী ▼ চারদিকে চক্রান্ত ▼ গোপন বিদ্রোহী ▼ পাপের ফল ▼ তুমুল লড়াই ▼ উমরু দরবেশ ▼ টার্গেট ফিলিস্তিন ▼ গাদ্দার ▼ বিষাক্ত ছোবল ▼ খুনী চক্রের আস্তানায় ▼ পাল্টা ধাওয়া ▼ ধাপ্পাবাজ ▼ হেমসের যোদ্ধা ▼ ইহুদী কন্যা ▼ সামনে বৈরুত ▼ দুর্গম পাহাড়

এ সিরিজের পরবর্তী বই ক্রুসেড-২৬

ভণ্ড পীরের কাণ্ড

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পুনর্জাগরণ।
চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন
হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা?
ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?
চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।
তাওহীদুল ইসলাম বাবু
চীনের মুক্তিপাগল মানুষের মরণপণ সংগ্রামের
কাহিনী নিয়ে লিখেছেন এক নতুন রহস্য সিরিজ–
'অপারেশন'।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের বই

আতংকিত নানকিং ▼ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত ▼ ব্ল্যাক আর্মির কবলে ▼ হাইনান দ্বীপে অভিযান ▼ অশান্ত চীন সাগর ▼ বিধ্বস্ত শহর ▼ ড্রাগনহিলের বিভীষিকা ▼ মৃত্যু দ্বীপ ▼ রক্তাক্ত প্রাচীর

অচিরেই বেরুচ্ছে অপারেশন-৯

রক্তাক্ত প্রাচীর

খৃস্টান সম্রাট বিলডনের দরবার। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মিত্র ইয়াজউদ্দিন মাসুদের দুই দূত কথা বলছিল সম্রাটের সাথে।

'আপনি দেরী না করে দামেশকে অভিযান চালান। আইয়ুবী এখন দামেশক থেকে অনেক দূরে। আর দামেশক হচ্ছে আইয়ুবীর শক্তি ও ক্ষমতার মূল ঘাঁটি। আইয়ুবীর ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার এটাই মোক্ষম সময়।'

দূতের পরামর্শ শুনে সম্রাট বিলডন বললেন, 'কিন্তু যদি আমি রওনা হওয়ার আগেই সুলতান আইয়ুবী দামেশকের দিকে রওনা হয়ে যান?'

'এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ইয়াজউদ্দিন মাসুদ সুলতানকে আটকে রাখার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করবেন, যাতে আপনি সহজেই দামেশকে ছুটে যেতে পারেন।'

এ কথায় সম্রাট বিলডন খামোশ মেরে গেলেন। গভীর চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো তাঁর চোখে মুখে। তিনি খানিক চিন্তা করে বললেন, 'সুলতান আইয়ুবীর কাছে দামেশকের কর্তৃত্ব হারানো আর আত্মহত্যা করা এক কথা। এ অবস্থায় নিশ্চয়ই তিনি জীবনের সবচে বড় ঝুঁকিটি নিতেও দ্বিধা করবেন না।

দুর্বলও যখন বুঝতে পারে, লড়াইটা তার জীবন মরণের প্রশ্ন তখন সে কতটা মরিয়া হয়ে উঠতে পারে, তোমরা না জানলেও আমি তা জানি। জেনে শুনে আমি সাপের ছোবল খেতে যাবো কেন?'

দূত বললো, 'এ ব্যাপারেও আমাদের মধ্যে আলাপ হয়েছে। ইয়াজউদ্দিন মাসুদ আপনাকে জানাতে বলেছেন, যখন সুলতান আইয়ুবী নাসিবা থেকে রওনা হবেন তখন থেকেই আমরা আমাদের কাজ শুরু করে দেবো।'

দূত আরো বললো, 'আমরা তার সাথে প্রকাশ্য লড়াইয়ে আপাতত যেতে পারবো না। তবে তিনি রওনা হওয়ার পর প্রতি রাতেই হলব ও মুশেলের বাহিনী তার ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালাবে। এ ব্যাপারে সতর্কতার সাথে আমরা এখনই কাজ শুরু করে দিয়েছি। আমাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষ।'

দূতের এ উদ্দীপনাময় বক্তব্য শুনেও সম্রাট খুব বেশী আশান্বিত হতে পারলেন না। বললেন, 'তোমাদের ছিটেফাটা হামলায় তিনি কাবু হয়ে যাবেন এমনটি মনে করার কোন কারণ আছে?'

'সম্রাট, আমরা মোটেও ছিটেফাটা হামলা চালাবো না। আমি আপনাকে এতটুকু নিশ্চয়তা দিতে চাই, যখন তিনি দূর থেকে দামেশকের মিনারের চূড়া দেখতে পাবেন তখন তার বাহিনী আর যুদ্ধ করার মত অবস্থায় থাকবে না।'

দূত তাকে আশ্বস্ত করে বললো, 'তিনি দামেশক পৌঁছার আগেই আমাদের কমান্ডো আক্রমণ তার কোমর ভেঙে দেবে।

আপনি এমন এক শত্রুর সাথে লড়বেন, যার চোখে থাকবে আগুনের স্ফুলিঙ্গ, কিন্তু হাত দু'টো থাকবে শিথিল আর দাঁড়িয়ে থাকার জন্য তিনি তালাশ করবেন সামান্য অবলম্বন।'

'হলব এবং মুশেলের অবস্থা জানলাম। কিন্তু বিভিন্ন পরগণার ছোট ছোট মুসলিম রাজ্যগুলোর অবস্থা কি? তাদের আমীররা কি লড়াই শুরু হলে আমাদের পক্ষ নেবে, না আইয়ুবীর?'

'তাদেরকে আমরা এ কথা বুঝানোর চেষ্টা করছি যে, আইয়ুবীর হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাদের সবাইকেই একজোট হয়ে চেষ্টা করতে হবে। নইলে সে আমাদের সবাইকে গিলে ফেলবে। আপনি চিন্তা করবেন না, তারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।'

সম্রাট যেন তাদের কথায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ প্রস্তাব মেনে নিচ্ছেন এমন একটি ভাব নিয়ে বললেন, 'আমাদের কিছু ফৌজ কি তোমাদের সাথে দিয়ে দেবো, যাতে কমান্ডো অভিযানের সময় তারা তোমাদেরকে সহায়তা করতে পারে? আমাদের দক্ষ কমান্ডোরা তোমাদের সাথে থাকলে তোমাদের হামলা অনেক বেশী কার্যকর হবে। আইয়ুবী তখন চোখে সর্ষে ফুল দেখবে।'

'আপনার প্রস্তাবটি উত্তম, কিন্তু এখানে একটু সমস্যা আছে। আপনার সৈন্যদের মুশেলে অবস্থান করার অনুমতি দিলে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আমরা আপনার সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ আছি। কিন্তু আমরা তো সুলতান আইয়ুবীকে এই ধোঁকায় ফেলে রেখেছি যে, আমরা তার বন্ধু।'

দূতরা যখন এসব আলাপ করছিল তখন সম্রাট বিলডনের সঙ্গে তার দু'জন জেনারেল সেখানে উপস্থিত ছিল। ইয়াজউদ্দিনের এই দূতরাও ছিল সামরিক ব্যক্তিত্ব। যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে তারা ছিল অভিজ্ঞ। তারা এমনভাবে কথা বলছিল, যেন মুশেলকে নিরাপদ রেখে বিলডনকে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া যায়।

দূতের জবাব শুনে সম্রাট বিলডন বুঝলেন, এই মুসলমানরা আইয়ুবীর বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে তার সাহায্য চাইছে। তিনি নিজেও আইয়ুবীর বিনাশ চান। অতএব এ মুহূর্তে একটি অভিযান চালালে মন্দ হয় না। কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করে দূতদের কাছে এ ব্যাপারে তার শর্ত আরোপ করতে শুরু করলেন।

'তোমাদের কথায় মনে হচ্ছে, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর রণকৌশল ও যোগ্যতা সম্পর্কে তোমাদের পরিপূর্ণ ধারনা নেই। তোমরা ভাবছো, কমান্ডো আক্রমণ করে তোমরা তাকে নাজেহাল করতে পারবে। কিন্তু তার কমান্ডো বাহিনী সম্পর্কে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।'

তিনি বললেন, 'আমি জানি, তারা কতটা ক্ষিপ্র ও দুর্দান্ত। তাকে রাতের অন্ধকারে হামলা করে কিছুই করতে পারবে না তোমরা। তার কমান্ডো বাহিনীর জাল ভেদ করে মূল বাহিনীর কাছেও পৌঁছতে পারবে না।'

সম্রাট বিলডন আরো বললেন, 'আমি যদি দামেশক অবরোধ করি তবে তিনি বজ্রবেগে ছুটে এসে আমাদের ওপর

আক্রমণ চালাবেন। এমতাবস্থায় দামেশকে অভিযান চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তোমরা জানো না, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে হাতের তালুর মতই যুদ্ধের সমস্ত ময়দান স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। তিনি আমাদের পরিকল্পনার খবর আমরা পরিকল্পনা নেয়ার সাথে সাথেই পেয়ে যান। তিনি ঈগল ও শকুনের মত বহু দূর থেকে শিকার দেখতে পান এবং সেখানে এমনভাবে ঝাপটা মারেন যে, তখন পিছু হটাও অসম্ভব হয়ে উঠে। আমি এমন আত্মঘাতি যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে পারি না।'

'কিন্তু মহামান্য সম্রাট।'

দূত মরিয়া হয়ে বললো, 'আইয়ুবী তার জীবনের সবচে নাজুক সময় অতিক্রম করছেন এখন। এভাবে বসে থাকতে দিলে সে আবারও সিংহের ন্যায় শক্তিশালী হয়ে উঠবে। সে আমাদের জন্য যেমন বিপদের কারণ, আমরা মনে করি আপনার জন্যও সে তেমনি বিপদজনক শত্রু। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে তিনি আবারও বৈরুত অবরোধ করবেন, এতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। আপনি কি তাকে আবারও সেই সুযোগ দিতে চান?'

'না, তা চাই না।'

তিনি বললেন, 'এ জন্য আমি আমার মত করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও নিচ্ছি। তাহলে তোমাদের বলি, আইয়ুবী যেন শান্তিতে থাকতে না পারে সে জন্য আমি আমার কমান্ডো বাহিনীকে নাসিবা অভিমুখে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা সুলতান আইয়ুবীর

সৈন্যদেরকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। এই বাহিনীর জন্য একটা মজবুত আশ্রয় দরকার। সেটা যদি তোমরা ব্যবস্থা করতে পারো তবে আমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সৈন্য বাহিনীকে এই কমান্ডো বাহিনী দিয়েই অস্থির করে রাখতে পারবো। তারা তখন আর যুদ্ধ করার যোগ্য থাকবে না।'

তিনি বললেন, 'তোমরা আমাদের বাহিনীকে আশ্রয় দান করবে, সাহায্য ও খাদ্য সরবরাহ করবে। আর আমি অস্ত্র ও যুদ্ধের সামগ্রী সরবরাহ করতে থাকবো।

তোমরা হলবের আমীর ইমামউদ্দিনকেও বলে দেবে, সে যেন আমার উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখে। আমার কমান্ডো বাহিনীকে যেন সময় মত আশ্রয় ও সাহায্য দেয়। অন্যান্য দুর্গাধিপতি যারা আছে তাদের দিকে লক্ষ্য রাখবে যেন তারা কেউ সুলতান আইয়ুবীর সাথে গিয়ে যোগ দিতে না পারে।'

সম্রাট বিলডনের সাথে ইয়াজউদ্দিন মাসুদের দূতদের শর্ত পাকা হয়ে গেল। ইয়াজউদ্দিন মাসুদ তার দূতদের শর্ত পাকা করার সমস্ত অধিকার দিয়ে দিয়েছিল। পাঠানোর সময় সে তাদের বলেছিল, 'যেভাবেই হোক সম্রাটের সাথে শর্ত পাকা করে আসবে। যদি ওরা কোন সুবিধা দাবী করে, মেনে নিও। এ মুহূর্তে ওদের সাহায্য আমাদের বিশেষ দরকার।'

সম্রাট বললেন, 'তাহলে তোমাদের সাথে কথা পাকা হয়ে গেল, কি বলো? এবার গিয়ে আনন্দ করো। আমাদের পরীরা নতুন মেহমান পেলে খুব খুশী হয়। বিশেষ করে মুসলমান মেহমানদের পেলে নাকি তাদের আনন্দের অন্ত থাকে না।'

সুতরাং তারা তাদের ঈমান এক খৃস্টান সম্রাটের কাছে শুধু এ জন্য বন্ধক রেখে দিল, যাতে তাদের রাজ্যটা নিরাপদ থাকে।

সম্রাটের কামরা থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। ওদের সামনে তখন খুলে যাচ্ছিল পতনের অতল তলে হারিয়ে যাওয়ার সব দরজাগুলো।

কামরা থেকে বেরিয়ে এলো দূত দু'জন। ওদের চোখে মুখে আনন্দের ঝিলিক। মিশন সফল হওয়ার আনন্দকে মধুরতর করার জন্য ওরা পা বাড়াল সেই পানশালার দিকে, যেখানে একটু আগে ডানাকাটা পরীরা তাদের মদ পরিবেশন করছিল। মদের চাইতে সেই নারীরাই যেন বেশী নেশা উদ্রেককারী।

'এই মুসলমানদের উপর বেশী বিশ্বাস করবেন না!'

সম্রাট বিলডনকে তার এক জেনারেল বললো, 'কারণ এই মুসলমানরা বিশ্বাসঘাতক। এখন যেমন আপনার সমস্ত শর্ত ওরা মেনে নিয়েছে তেমনি যখন প্রয়োজন মনে করবে আপনার অজ্ঞাতেই সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর পায়ের উপর গিয়ে লুটিয়ে পড়তেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।'

'আমার কমান্ডো বাহিনীর জন্য একটা আশ্রয়স্থল প্রয়োজন ছিল।' সম্রাট বিলডন বললেন, 'যদি মুশেলে আমি সেই আশ্রয় পেয়ে যাই তবে ধীরে ধীরে আমার সমস্ত সৈন্য সেখানে নিয়ে

জড়ো করবো। তারপর সুযোগমত ইয়াজউদ্দিনকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে আগে মুশেল দখল করবো। এরকমই হওয়া উচিত আমাদের সকলের পরিকল্পনা। মুসলমানদের আমরা কখনো ঐক্যবদ্ধ হতে দেবো না। তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে রাখবো এবং সুযোগ পেলেই টপ করে গিলে ফেলবো ছোটখাট রাজ্যগুলো। এভাবেই ধীরে ধীরে মুসলমানদের এলাকাগুলো অধিকার করে নিতে হবে আমাদের।'

'আপনার পরিকল্পনা নিঃসন্দেহ উত্তম। আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি, মুসলমানরা সুখ সুবিধা ও আমোদ স্ফূর্তিতে মত্ত। শাসক হওয়ার লোভে তারা অন্ধ। তারা তাদের ব্যক্তিত্ব, তাদের ধর্ম সব আপনার পায়ের তলায় রেখে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না যদি আপনি তাদের আস্থায় রাখতে পারেন। তারপর সুযোগমত তাদের গিলে ফেলা আপনার জন্য কোন ব্যাপার হবে না।'

'ইয়াজউদ্দিন বলো আর ইমামউদ্দিন বা ছোট ছোট মুসলিম ওমরারা, তারা শুধু এ জন্যই সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে রয়েছে, যাতে সবাই আপন আপন এলাকার শাসক হয়ে আরাম আয়েশে দিন কাটাতে পারে। তারা ঝামেলা ও বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে চায়।

কিন্তু সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আরাম আয়েশে রাজত্ব করতে অভ্যস্ত নন। তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে সবাইকে এক রণক্ষেত্রে এনে ফিলিস্তিন থেকে আমাদের বিতাড়িত

করতে চান। এই পরিকল্পনা নিয়েই তিনি মাঠে নেমেছেন। কিন্তু যাদের তিনি ঐক্যবদ্ধ করতে চান তারা এত বড় যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে ভয় পায়। আমি এই ভয়কে পুঁজি করেই তাদেরকে আইয়ুবীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবো।'

তিনি সেই জেনারেলের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমার মত আমিও মুসলমানদের বিশ্বাস করি না। যদি বুঝি তারা আমার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চিন্তা করছে, আমি তাদের সে চিন্তা সফল হতে দেবো না। ইয়াজউদ্দিন ও ইমামউদ্দিন বা তাদের কোন সাথী যদি এমন চিন্তা করে তবে আমার হাশিশ বাহিনী তাদের ফয়সালা করবে। হাশিশ বাহিনীর হাতে যে মরণ-বিষ আছে তাদের হত্যা করার জন্য তার তিল পরিমাণই যথেষ্ট।'

বিলডন তার জেনারেলদের বললেন, 'ইয়াজউদ্দিনের এই দূত দু'জনকে এমন খাতির যত্ন করো যেন তাদের বুদ্ধি জ্ঞান সব লোপ পেয়ে যায়। তাদের যেন স্মরণই না থাকে তাদের একটা ধর্ম আছে। জীবনকে ভোগ করার চিন্তাই হবে তাদের একমাত্র ধর্ম।'

তিনি জেনারেলদের আরো কিছু নির্দেশ দিলেন এবং তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'এসব কথা গোপন রাখবে। এই কামরায় দূতদের সাথে যে আলোচনা হলো সে কথা যেন কখনো বাইরে না যায়।

সব সময় মনে রাখবে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দারা বৈরুতে বসে নেই। তারা নিশ্চয়ই গোপন খবরের আশায়

মহলের চারপাশে ঘুর ঘুর করছে। চাই কি এই মহলেও তাদের চর থাকতে পারে, যাদের আমরা সনাক্ত করতে পারিনি।'

•

দূত দু'জন তখন মদ ও মেয়েদের নিয়ে স্ফুর্তিতে মশগুল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা মদের নেশায় জ্ঞান ও বিবেকশূন্য হয়ে পড়লো। এই বিবেকহীন দূতকে নিয়ে খেলছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুই তরুণী। কলের পুতুলের মতই তখন তারা দুই তরুণীর ইচ্ছা অনিচ্ছার জালে বন্দী।

অন্যান্য মেহমানরাও এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে মদ পান করছিল। কেউবা পান করছিল যুবতীদের রূপসুধা।

মাহফিলের নিমন্ত্রিত মেহমানরা যখন খোশগল্প ও পানাহারে মশগুল জ্যাকব তখন হন্যে হয়ে খুঁজছে সেই দূতদের। সম্রাটের দরজার সামনে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে রক্ষীদের কাছে বিষয়টি প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়াবে ভেবে ওখান থেকে সরে এসেছিল সে। তারপর অপেক্ষা করছিল তাদের বেরিয়ে আসার। কারণ সে জানে, ওরা সম্রাটের কাছে বসে থাকতে আসেনি। মিশন শেষ করে এক সময় তাদের বেরোতেই হবে।

দূতরা কখন সম্রাটের কামরা থেকে বেরিয়ে আসবে জানা নেই তার। তাই সে মাহফিলের সবখানেই নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিল। মাহফিলের মূল চত্বর ছাড়াও মেহমানদের বিশ্রামের জন্য এবং অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর জন্য অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি কিছু

এলাকা ছিল মহলের ভেতর দিকে। সেসব অঞ্চলের দরজার ওপর 'সংরক্ষিত' নোটিশ ঝুলানো থাকতো। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ওই 'সংরক্ষিত' এলাকায় সে এক দূতকে পেয়ে গেল।

দূত মদ পান করছিল। পরীর মত এক নারী তার হাতে তুলে দিচ্ছিল কারুকার্য খচিত মদের পেয়ালা। জ্যাকব তাকে দেখেই তার দিকে এগিয়ে গেল এবং সামরিক কায়দায় স্যালুট দিয়ে বললো, 'আপনি সম্ভবত মুশেলের অতিথি? আমি মুশেলবাসীদের খুব ভালবাসি।'

'আমি মুশেলের শাসক ইয়াজউদ্দিন মাসুদের রাজকীয় দূত।' দূত মদের নেশায় মাতাল ছিল। সে জড়িত কণ্ঠে যা বললো তার মানে হচ্ছে, 'আমি জানতে এসেছি, বৈরুতের খৃস্টানদের মনে মুশেলের মুসলমানদের প্রতি কতখানি ভালবাসা আছে?'

দূতের ভাষা যেমন এলোমেলো ছিল তেমনি তার পা-ও টলছিল। সে এত বেশী মদ পান করেছিল যে, নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না।

সে এলোমেলো পায়ে জ্যাকবের কাছে এসে তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বললো, 'মদের এমনই গুণ যে, মানুষের মন থেকে ধর্মের বিভেদ দূর হয়ে যায়। সেখানে জন্ম নেয় ভালবাসা। আমার এখন কেবল ভালবাসতে ইচ্ছে করছে।'

দূত টলতে টলতে বললো, 'তোমাকে মনে হচ্ছে কতদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোমার গলায় ঝুলানো ছোট্ট এই ক্রুশটাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। তোমার এই বর্শাটাকে

ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। যেদিন এই বর্শা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বুকে বিদ্ধ হবে সেদিন আমি প্রধান সেনাপতি হয়ে যাবো।'

সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ ছিল না জ্যাকবের। তার ডিউটি শুধু ঘোরাফেরা করে দেখা, সন্দেহজনক কিছু দেখলে সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা। দূতকে টলমল অবস্থায় রেখেই ওখান থেকে সরে এলো জ্যাকব। মনোনিবেশ করলো নিজের টহল ডিউটিতে। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পেলো, ওই দূতকে দু'জন লোক ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে পাশের এক কামরায়। দূতের তখন বেহাল অবস্থা, কোন হুশ নেই।

মাঝরাতে জ্যাকবের ডিউটি শেষ হলো। নাচগান তখনো চলছিল। জ্যাকব ও তার সাথীদের স্থলে অন্য লোক এলো ডিউটিতে। জ্যাকব তার কামরায় চলে গেল।

জ্যাকব দেরী না করে ডিউটির পোষাক পরিবর্তন করে পরে নিল সাধারণ পোষাক। যদিও মধ্যরাত পর্যন্ত ডিউটি করে সে খুবই ক্লান্ত ছিল কিন্তু বিছানায় যাওয়ার কথা সে ভাবতে পারলো না। তার পরিবর্তে সে আলতো পায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এলো। রাতের অন্ধকার গিলে ফেললো তাকে।

সাবধানে পা চালাচ্ছিল সে। তার গতি ছিল সেই দিকে যেখানে সব রাজকন্যার মত সুন্দরীরা থাকে। এই মেয়েরা সাধারণ মেয়েদের মত নয়। এরা সবাই ঝানু গোয়েন্দা। প্রচুর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের গড়ে তোলা হয়েছে। তাদের শেখানো

হয়েছে নানা রকম দুষ্কর্ম।

গোয়েন্দাগিরীর কৌশল ও মানুষকে জালে আটকানোর কায়দা কানুন শেখানো হলে ওদের পাঠিয়ে দেয়া হয় কোন মুসলমান এলাকায়। সেখানকার আমীর, সেনাপতি এবং শাসকদের পেছনে লেগে থাকে তারা। তাদের ওপর থাকে খৃস্টানদের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের নির্দেশ ও দায়িত্ব।

প্রভাবশালী মুসলমানদের জালে ফাঁসানোর কাজটি তারা সম্পন্ন করে নিঁখুতভাবে। যেসব মুসলিম অঞ্চল খৃস্টানদের অধিকারে চলে গেছে সেখানেও এইসব মেয়েদের পাঠানো হয়। এসব অঞ্চলে তাদের কাজ থাকে মুসলমান গোয়েন্দাদের অনুসন্ধান করা এবং খৃস্টান স্বার্থবিরোধী কোন তৎপরতা যেন চলতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখা।

এ ছাড়া মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনার বিনাশ সাধনের জন্য নাচ-গান ও নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা। মুসলিম যুবকদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করার জন্য তাদের মধ্যে নানা রকম নেশার সামগ্রী বিতরণ করাও তাদের দায়িত্ব।

এসব মেয়েরা যে বাড়িটিতে থাকতো সেটি ছিল একটি পাকা দালান। এ বাড়ীর উল্টো দিকেই থাকে নর্তকী ও গানের মেয়েরা। তাদের মর্যাদা গোয়েন্দা মেয়েদের মত না হলেও তাদের শরীরের জৌলুস এবং সৌন্দর্য গোয়েন্দা মেয়েদের চেয়ে কম নয়।

তাদের কাজ রাজকীয় অনুষ্ঠানে মেহমানদের মধ্যে আনন্দ বিতরণ করা। প্রতি রাতেই কোন না কোন উপলক্ষে রাজকীয়

অনুষ্ঠানের কোন বিরাম নেই। তবে বাইরের কোন মেহমান এলে আসর হয় জমজমাট।

সে রাতে মুশেলের মুসলমান দূতদের সম্মানে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল তাতেও ছিল নাচগানের ব্যাপক আয়োজন। কিন্তু সেদিন নর্তকী ও গায়িকাদের মক্ষীরানী সারা উপস্থিত ছিল না সেখানে।

সারা ছিল ভুবনমোহিনী এক নারী। অনিন্দ্য সুন্দরী সারার চেহারায় ছিল কমনীয়তার দুর্লভ আভা। চোখে মায়ার অঞ্জন। তার চুলে ছিল মেঘমেদুর আকাশের মাধুর্য। ইউরোপীয় মেয়েদের মত স্বর্ণকেশী ছিল না সে। দেখলে যে কেউ ভাববে, এ মেয়ে মিশর কিংবা গ্রীসে জন্মগ্রহণ করেছে। তবে বৈরুতের মেয়েও হতে পারে। কিন্তু কেউ জানতো না এ মেয়ে কোথাকার বাসিন্দা।

জ্যাকব গোয়েন্দা মেয়েদের দালানের পাশ দিয়ে সারার কামরার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। নাচগানের আসরে সারাকে না পেয়ে তার মন উতলা হয়ে আছে। তার অনুপস্থিতির কারণ কি? সে কি অসুস্থ? নাকি এই জঘন্য পরিবেশ ও পেশা থেকে বাঁচার জন্য সে কোথাও পালিয়ে গেছে?

কারণ জ্যাকব জানে, সারা এই কাজ ও পেশাকে খুবই ঘৃণা করে। তার অসুখী অন্তরের অনেক কথাই জানে জ্যাকব। এখানে সে স্বেচ্ছায় আসেনি। পরিস্থিতি তাকে এখানে আসতে এবং এই পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে।

জ্যাকবের মনে পড়ে গেল সারার সাথে তার প্রথম

সাক্ষাতের কথা। বরাবরই রাজকীয় অনুষ্ঠানগুলোতে তার ডিউটি থাকে। এমনি এক অনুষ্ঠানে প্রথম সে সারাকে দেখতে পায়।

সারাকে দেখেই চমকে উঠে জ্যাকব। এত সুন্দরও মানুষ হয়! প্রথম দেখাতেই মুগ্ধতার আবেশে যেন গলে পড়ে জ্যাকব। সেই মুগ্ধতাই তাকে টেনে নেয় সারার কাছে।

মানুষের মন ভালবাসা টের পায়। জ্যাকবের মুগ্ধ ভালবাসাও যথাসময়ে টের পায় সারা। সবাই সারাকে খুব অহংকারী মেয়ে বলেই জানতো। কারণ সে কারও সাথে কথা বলতো না, কারও সাথে তেমন মিশতোও না। কিন্তু জ্যাকবের মধ্যে সে কি পেলো সেই জানে, সে জ্যাকবকে পছন্দ করতে লাগলো।

এক রাতে অনুষ্ঠান শেষে সারা মহল থেকে বেরিয়ে তার কামরার দিকে যাচ্ছিল, পথে জ্যাকবকে পেয়ে গেল। সারা তাকে বললো, 'তুমি কি আমাকে আমার কামরা পর্যন্ত এগিয়ে দেবে?'

'একা যেতে ভয় পাচ্ছো?' জ্যাকব বললো, 'এখানে তো ভয়ের কিছু নেই। তোমাকে এখানে কেউ অপহরণ করতে আসবে না।'

'তা হয়তো আসবে না।' সারা মুখ গম্ভীর করে স্বগতকণ্ঠে বললো, 'তবে আমি নিজেই যে নিজের ছিনতাইকারী হয়ে যেতে চাই।' তারপর জ্যাকবের দিকে ফিরে বললো, 'একা যেতে ভয় পাচ্ছি না, তবে এ পথটুকুতে তোমার সঙ্গ কামনা করছি।'

জ্যাকবের জন্য এ ছিল এক অভাবিত পাওয়া। যার জন্য তার মুগ্ধ চিত্তের ব্যাকুল আকর্ষণ সেই সারা তাকে সঙ্গ দিতে বলছে! রাজি হয়ে গেল জ্যাকব।

জ্যাকব নিজেকে একজন হুশিয়ার পুরুষ বলেই জানতো। নিজের পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সে যথেষ্ট সচেতনও ছিল। কত মেয়ে তাকে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার প্রস্তাব দিয়েছে কিন্তু জ্যাকব তাতে সাড়া দেয়নি।

সে বরাবর নিজেকে ওইসব মেয়েদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। গায়ে পড়ে প্রেম নিবেদন করা মেয়েগুলোকে সে ভাবতো নষ্টা, অপবিত্র। যাদের মধ্যে ইজ্জত ও সতীত্ব বলে কিছু নেই তাদেরকে কেন ভালবাসতে যাবে সে?

জ্যাকব তাদের প্রত্যাখ্যান করায় তার দাম আরো বেড়ে যায়। প্রত্যাখ্যাত মেয়েরা তার প্রতি আরো বেশী করে আকর্ষণ বোধ করতে থাকে।

জ্যাকব যেই পরিবেশে ছিল সেখানে ব্যভিচারকে পাপের কাজ মনে না করে আনন্দ ফুর্তির বৈধ উপায় মনে করা হতো। কিন্তু জ্যাকব ছিল এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। সারাকে ভাল লাগলেও তাকে তাদেরই একজন মনে করে জ্যাকব নিজেকে গুটিয়ে নেয়। নিজের ভাল লাগাকে ভালবাসায় পরিণত করা থেকে বিরত থাকে।

ওদিকে জ্যাকবের প্রতি সারার আগ্রহ দিন দিন বাড়তেই থাকে। যখন সারা জানতে পারে, জ্যাকব মদ পান করে না, নেশা করে না, অন্য মেয়েদের কাছে যায় না তখন তার আগ্রহ

ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। সারা ছিল বুদ্ধিমতি এবং সেও বেলেল্লাপনা পছন্দ করতো না। চরিত্রের এই সৌন্দর্যই মনের দিক থেকে পরস্পরকে কাছাকাছি নিয়ে এলো।

সারা চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি তো আমার নাচ দেখে কিছু বললে না! অন্যরা তো এভাবে রাস্তায় আমাকে একা পেলে আমার নাচ ও শিল্প নৈপূন্যের প্রশংসা করতে করতে মুখে ফেনা তুলে ফেলতো।'

'আমার মুখ থেকে তোমার নিজের প্রশংসা কোন দিন শুনতে পাবে না।' জ্যাকব উত্তর দিল, 'অবশ্যই তোমার শরীরে আছে অদ্ভুত এক মাদকতা। যে রূপের বর্ণনা করা আমার সাধ্যের অতীত। যাদুর চেয়েও দ্রুত তা মানুষকে মোহগ্রস্ত করতে পারে এ কথাও আমি অস্বীকার করবো না। আল্লাহ তোমার চেহারায় আকর্ষণের যে সম্পদ ঢেলে দিয়েছেন তার কোন তুলনা আমার সামনে নেই। কিন্তু তোমার এ অপূর্ব দেহবল্লরী অন্যের অঙ্গুলি হেলনে নাচবে তা আমার ভাল লাগে না।'

জ্যাকব আরো বললো, 'এই সৌন্দর্য কোন বাজারের পণ্য নয়। তোমাকে এ রূপমাধুর্য দান করা হয়েছে কোন একক পুরুষের জন্য। যদি তুমি তেমন কোন পুরুষকে কবুল বলে গ্রহণ করতে পারতে এবং এই দেহ-সম্পদ তাকে দান করে নিজেকে ধন্য মনে করতে তবে সেটাই হতো শোভন। কিন্তু তুমি যা করছো তা আমার পছন্দ নয়। আমার কথায় তুমি যদি রাগ করো তাতেও আমার করার কিছু নেই। আমি নিজের

অন্তরের সাথে প্রতারণা করতে পারবো না।'

জ্যাকবের এমন অকপট ও স্পষ্ট উচ্চারণে চমকে উঠল সারা। মনে মনে বললো, আহা! আমার মনের কথাগুলো তুমি জানলে কি করে? থমকে দাঁড়িয়ে বললো, 'জ্যাকব, তুমি কি সত্যি চাও না আমি রাজ দরবারে নাচি?'

'আমি তো স্পষ্ট করেই আমার মতামত বলেছি। কালেমা পড়ে কারো ঘরণী হলেই তুমি তোমার প্রতি সুবিচার করতে। রূপের জৌলুস প্রদর্শন আর ভালবাসার প্রেম বিতরণ এক জিনিস নয়।

প্রেম মানুষকে সম্মান করতে শেখায়, অন্যকে মূল্য দিতে শেখায়। যদি ভালবাসার আবরণে নিজেকে সাজিয়ে নিতে পারতে, নিজেকে নিয়ে যেতে পারতে পর্দার আড়ালে তবে তোমার এ দেহের ওপর আল্লাহর রহমত নাজিল হতো। তুমি যা করছো তাতে আল্লাহর দানকেই অপমান করছো।'

'জ্যাকব!' সারা বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কোন কালেমার কথা বলছো? কোন পর্দার কথা বলছো? খৃস্টানরা তাদের কনেকে কখনো বোরখার আবরণে নিয়ে যায় না।'

জ্যাকব একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কিন্তু সহসাই নিজেকে সামলে নিয়ে হো হো করে হেসে উঠে বললো, 'আমার মাথায় সব সময় মুসলমানদের শালীনতার ছবি ভাসতে থাকে। নিজে তো এখনো বিয়ে করিনি, কিন্তু মুসলমানদের বিয়ে দেখেছি। যা সুন্দর ওদের বিয়ের অনুষ্ঠান!'

সারা তাকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। জ্যাকব আর কি বলবে কথা খুঁজে পায় না। সে মুখ ঘুরিয়ে শূন্যে দৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সারা অস্থির হয়ে জ্যাকবের বাহু আকড়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি তো মুসলমান নও জ্যাকব? আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে, তুমি গোয়েন্দা।' সারা বললো, 'চাকরীর খাতিরে হয়তো তুমি নিজেকে খৃস্টান বানিয়ে রেখেছো, অথবা খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছো, আমি এ কথাই বুঝাতে চাচ্ছি।'

'জ্যাকব কখনও মুসলমান হতে পারে না সারা!' জ্যাকব বললো, 'আমার নাম গিলবার্ট জ্যাকব। ক্রুশের পক্ষে কাজ করার জন্য সৈনিকের খাতায় নাম লিখিয়েছি। আমি জানি মুসলমানরা আমার শত্রু।

কিন্তু ছোটবেলায় আমাদের পড়শী ছিল এক মুসলিম পরিবার। ওই পরিবারের ছেলেমেয়েরা ছিল আমার খেলার সাথী। আমি তাদের এক বিয়ের অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। সেই অনুষ্ঠান আমার এত ভাল লেগেছিল যে, আজো স্মৃতিতে তা অক্ষয় হয়ে আছে।'

'তোমাকে একটা গোপন কথা বলবো?' সারা বললো, 'হয়তো কথাটা শুনলে তুমি আমাকে ভুল বুঝতে পারো। তবু তোমাকে বলি, আমারও কিন্তু মুসলমানদের আচার অনুষ্ঠান ভাল লাগে। তাদের বিয়ে, পর্দা এসবের মধ্যে একটা পবিত্রতা ও প্রাণ আছে। কালেমা পাঠ করার পর স্বামীটি স্ত্রীকে ভালবাসার

সাথে সাথে তাকে যে মর্যাদা দেয়, যেভাবে স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষায় সচেষ্ট থাকে আমাদের সমাজে তা নেই। আমাদের সমাজে নারী পুরুষের যে অবাধ মেলামেশা ও যৌনাচারের ছড়াছড়ি তা আমার মোটেও ভাল লাগে না।' কথা শেষ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো সারা।

'এটা কি তোমার মনের কথা?'

'কেন, এটা কি তুমি বুঝতে পারো না, একজন নারীকে উলঙ্গ করলে তার মনের কি অবস্থা হতে পারে? তখন সে নারী অনুভব করে পর্দা ও আবরণের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক শান্তি ও পবিত্রতা ছিল। অনুভব করতে পারে সে কি হারিয়ে ফেলেছে।' সারা বললো, 'যখন একজন নারীর সতীত্ব ছিনিয়ে নেয়া হয় তখন আত্মগ্লানিতে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে তার।'

জ্যাকব অবাক হয় সারার কথা শোনে। বলে, 'এসবই তোমার মনের কথা?'

'হ্যাঁ জ্যাকব, লোলুপ একদল পুরুষের সামনে নাচায় কোন আনন্দ ও স্বাদ নেই। নিজের সৌন্দর্যের যাদু দিয়ে অন্যকে আঙ্গুলের ইশারায় নাচাতে যারা পছন্দ করে আমি সে ধরনের মেয়ে নই।

আমি যখন একাকী আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন আমাকে একটি ঘৃণার পাত্রী মনে হয়। আমি নিজেকে ঢেকে রাখতে পারি না। আমার এই শরীরের ওপর কোন পর্দা চাপাতে পারি না। নাচের সময় আমার শরীর যত উন্মুক্ত হয় ততই আমার আত্মার ওপর ছড়িয়ে পড়ে গ্লানির চাদর। আর এই

গ্লানিতেই কেটে যায় আমার প্রতিটি প্রহর।'

'তুমি যদি এই পেশাকে এতই ঘৃণা করো তবে ছেড়ে দাও না কেন?'

'এই পেশা ছেড়ে আমি কোথায় যাবো? আমার যে পালিয়ে যাওয়ার কোন জায়গা নেই।'

জ্যাকব বললো, 'জায়গা পেলে তুমি কি এখান থেকে পালিয়ে যেতে?'

'কোথায় যাবো? কার কাছে যাবো? কে আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেবে?' সারা বললো, 'আজ যদি এখান থেকে পালাই তবে দেখা যাবে কোন দালালের খপ্পরে পড়ে আমার ঠাঁই হয়েছে কোন অন্ধগলিতে। তুমি কি চাও আমি এখান থেকে পালিয়ে কোন পতিতালয়ে নিক্ষিপ্ত হই?'

'না, তা চাইবো কেন? আমি শুধু জানতে চাচ্ছিলাম বর্তমান পেশায় তুমি সন্তুষ্ট কি না? সন্তুষ্ট না হলে কতটুকু মর্মপীড়া অন্তরে লালন করছো? যে পরিবেশকে তুমি পছন্দ করো না সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য তুমি কতটা ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত?'

'জ্যাকব!' সারা অন্তরঙ্গ স্বরে বললো, 'তুমি কি আমাকে পছন্দ করো, নাকি আমার নাচকে?'

'আমি সেই সারাকে পছন্দ করি যে এই পেশাকে ঘৃণা করে আর এ জন্য পেরেশান ও উদাস থাকে।' জ্যাকব বললো, 'কেন, আমি তোমাকে বলিনি,- এই বেশে তুমি আল্লাহকে

অপমান করছো?'

'তুমি এই সেনাদলে ভর্তি হলে কি করে?' সারা বললো, 'তোমার তো কোন শহরের গীর্জার পাদরী হওয়া উচিত ছিল। আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো, তুমি দৈনিক কি পরিমাণ মদ পান করো?'

'আমি মদের গন্ধটাও ঘৃণা করি।'

'তবে তো তুমি মুসলমান!' সারা দৃঢ়তার সাথে বললো, 'যদি তুমি তা না হও তবে তোমার বাবা মুসলমান ছিলেন। তুমি নারীদের পর্দায় দেখতে চাও, তোমার নাচ পছন্দ নয়, তুমি মদের গন্ধও সহ্য করতে পারো না। এর মানে কি? কোন খৃস্টান কি এসব ঘৃণা করে?'

প্রশ্ন শুনে জ্যাকব যেন বোবা হয়ে গেল। সে এর কি জবাব দেবে? সে ফ্যালফ্যাল করে সারার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'জ্যাকব!' সারা বললো, 'কিছু মনে করো না। তুমি যদি মুসলমানও হও তবু তোমার কাছে আমার একটি প্রশ্ন থেকেই যাবে, তুমি কি আমাকে ভালবাসো? কারণ তোমাকে নিয়ে আমি বড় বিভ্রান্তির মধ্যে আছি।

আমাকে দেখলেই প্রেম নিবেদন করার জন্য দুনিয়ার মানুষ হামলে পড়ে অথচ তুমি কোনদিন মুখ ফুটে কিছু বলোনি। কিন্তু কেউ যেখানে আমার মনের হদিস নিতে চায় না সেখানে তুমি কেন আমার ব্যথায় ব্যথিত হও? কেন জানতে চাও আমি এই পেশা ছেড়ে দেয়ার জন্য ঝুঁকি নিতে চাই কিনা?'

'সারা, এ প্রশ্নের আমি কি জবাব দেবো!' জ্যাকব বললো,

'তোমার বেদনা যে আমার হৃদয় অনুভব করে। আমি যে তোমার মঙ্গল চাই। কেন যে চাই তা আমি নিজেও জানি না।'

এই সাক্ষাতের পর তারা পরস্পরের প্রতি আরও তীব্র আকর্ষণ বোধ করতে থাকে। মনের দুঃখ লাঘব করার জন্য সারা ছুটে যায় জ্যাকবের কাছে। জ্যাকবও সুযোগ পেলেই দেখা করে সারার সাথে।

তাদের মধ্যে ভালমন্দ নানা রকম কথা হয়। একে অন্যের কাছে খুলে দেয় হৃদয়ের অর্গল। এভাবেই সারা ও জ্যাকবের মাঝে মন দেয়া নেয়া চলতে থাকে। সারা জ্যাকবকে বলে, 'তোমার চালচলন ও ধ্যান ধারণা একেবারে মুসলমানদের মত।'

জ্যাকবের মনেও প্রশ্ন জাগে, সারা কি মুসলমান? নইলে মুসলিম আচারের প্রতি তার এত শ্রদ্ধা কেন? সে সারার কাছে একাধিকবার জানতে চেয়েছে, মুসলমানদের সে এত বেশী ভাল মনে করে কেন? সে কি মুসলমান? কিন্তু সারার কাছ থেকে এ প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর সে পায়নি।

মোটের উপর দু'জনই যে মুসলমানদের ভালবাসে এটা ওরা কেউ গোপন করতে পারেনি। এক সময় ওরা অনুভব করে, চিন্তার এ ঐক্যই তাদেরকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে এবং তারা একে অপরকে ভালবেসে ফেলেছে।

সেই রাতে জ্যাকব যখন ডিউটি থেকে ফিরে সারার অনুপস্থিতির কারণ জানার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল তখন তার

মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল এইসব স্মৃতি ও ভাবনাগুলো। তার মনে প্রশ্ন জাগছিল, সারা কি অসুস্থ? নাকি সে পালিয়ে গেছে এই পঙ্কিলতার জগত থেকে? এমন তো সচরাচর হয় না, বাইরের মেহমান এলো অথচ নাচার জন্য তার ডাক পড়েনি?

সারা এবং তার সঙ্গী মেয়েরা যে বাড়ীতে থাকে সেখানে সাধারণের যাতায়াত নিষিদ্ধ। এমনকি ডিউটি ছাড়া সৈনিকদেরও কারো সেই বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। তবু জ্যাকব সে বাড়ীতে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েছিল এ জন্য যে, সে জানতো, মহলের মেয়েরা এখনো সম্রাটের দরবারে জলসায় ব্যস্ত। আর যারা মাহফিলে যায়নি এতক্ষণে তাদের ঘুমিয়ে পড়ার কথা।

জ্যাকব নির্বিঘ্নে সেই বাড়ীর চার দেয়ালের সীমানায় পৌঁছে গেল। মূল গেট দিয়ে না ঢুকে দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করলো সে। যাতে কারো নজরে না পড়ে সে জন্য অন্ধকারে পা টিপে টিপে সে সারার কামরার দরজায় পৌঁছে গেল।

দরজায় টোকা না দিয়ে সে আস্তে করে হাত দিয়ে ভেতরের দিকে মৃদু চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা।

বসার কামরা পেরিয়ে সে ভেতরের কামরায় চলে গেল। সেখানে ছোট একটি প্রদীপ জ্বলছে। তার ক্ষীণ আলোতে সে দেখতে পেল সারা বিছানায় শুয়ে আছে। তার দু'চোখ বন্ধ। বাচ্চা শিশুর মত অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

তার ছড়ানো চুলগুলোর পাশে পড়ে আছে একটি হাত। খোলা জানালা দিয়ে কামরায় প্রবেশ করছে ভূমধ্যসাগরের শীতল হাওয়া। সেই হাওয়ায় তার এলোমেলো চুলগুলো

সামান্য নড়ছে।

ঘুমের অতল তলে ডুবেছিল সারা। জ্যাকবের উপস্থিতি টের পায়নি। জ্যাকব তার হাত সারার কপালে রাখলো। কপালটা একটু গরম। না জ্বর নয়, যুবতী মেয়েদের শরীরে এমন উত্তাপ থাকাই স্বাভাবিক। জ্যাকব আশ্বস্ত হলো, সারার শরীর খারাপ নয়।

'সারা, প্রেম কাননের সবচে সুন্দর ফুলটি তুমি, যে ফুল সম্রাটদের হাতে পড়ে শুকিয়ে যায়।' জ্যাকব মনে মনেই বললো, 'তুমি প্রভাতের সেই তারা, দিনের সূর্যতাপে যা নিভে যায়, কিন্তু রাতের আঁধারে আবার তা চমকাতে থাকে।

সারা, আফসোস! তোমার জীবনটা রাতের আঁধারেই কেটে যাচ্ছে। এ আঁধারের গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসার কি কোন উপায় নেই? তোমাকে আমার এত ভাল লাগার কারণ কি? তুমি আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করেছো আমি মুসলমান কিনা? একই প্রশ্ন তো আমারও।

তুমি কোন মুসলমান মায়ের গর্ভে জন্ম নেয়া শিশু নওতো? তোমার শিরায় তো কোন মুসলমান পিতার রক্ত প্রবাহিত নেই? কে এই রহস্যের পর্দা উন্মোচন করবে? আমি যেমন তোমার কাছে রহস্যময় তেমনি তুমিও আমার জন্য এক অপার রহস্য হয়েই রইলে।'

জ্যাকবের জানা ছিল, খৃস্টান সৈন্যরা মুসলমান কাফেলায় হানা দিয়ে লুটপাট করার সময় কেবল ধন সম্পদই লুট করে না, যুবতী মেয়ে এবং সুন্দরী শিশু কন্যাদেরও অপহরণ করে নিয়ে

আসে। সেই শিশুদের তারা নিজেদের মত করে গড়ে নেয়। তাদের ট্রেনিং দিয়ে গোয়েন্দা বানায়। বেহায়াপনা ও নাচ-গানের শিক্ষা দিয়ে তাদের ব্যবহার করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে।

জ্যাকবের মনে প্রশ্ন জাগে, সারাও কি এমনি হতভাগীদের একজন? নইলে দীর্ঘদিন এ জাতির মধ্যে লালিত পালিত হওয়ার পরও তার আবেগ ও প্রেরণায় বেহায়াপনার প্রতি ঘৃণা থাকবে কেন? কেন মুসলিম আচারের প্রতি থাকবে হৃদয়ের টান?

জ্যাকব তার ভাবনায় এতটাই ডুবে গিয়েছিল যে, সে ভুলেই গিয়েছিল কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। যে মহলে কোন পুরুষের আসার অনুমতি নেই সেখানে এই গভীর রাতে তার দাঁড়িয়ে থাকাটা যে অন্যায় এ চিন্তাও তার মাথায় ছিল না। সারা তার অন্তরে এমনভাবে স্থান করে নিয়েছিল যে, সব বিপদ তুচ্ছ করে সে সারার কথাই ভাবছিল।

এক সময় তার সম্বিত ফিরে এলো। সে প্রদীপটা নিভিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সারাও জেগে উঠলো।

'কে?'

জ্যাকব তার ভীতিমাখা কম্পিত স্বর শুনতে পেয়ে বলল, 'আমি জ্যাকব!'

'এই সময় এখানে তুমি! এত রাতে কেন এসেছো এখানে?' সারার স্বরে ক্রোধ বা রাগ নয়, ছিল ভীতি ও ভালবাসা। সহানুভূতির স্বরে সে বললো, 'এখানে কেউ তোমাকে দেখতে পেলে কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছো?

সোজা তোমাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেবে। আমাকে বাইরে ডেকে নিতে।'

'কোন গুরুত্বপূর্ণ মেহমান এলে সেই জলসায় অবশ্যই তোমার ডাক পড়ে। আজ নাচের আসরে তোমাকে না দেখে ভাবলাম তুমি অসুস্থ। এই দুশ্চিন্তাই আমাকে এই বিপদের মধ্যে টেনে এনেছে। তুমি অসুস্থ নওতো?'

জ্যাকব অন্ধকারে তার পালংকে বসতে বসতে বললো, 'আলোটা এ জন্য নিভিয়ে দিলাম যাতে কেউ দেখে না ফেলে আমি এখানে। বিশ্বাস করো, এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই আমার।'

'আমার আত্মা অসুস্থ জ্যাকব।' সারা বললো, 'আমি যখনই কোন অনুষ্ঠানে নাচি তখন আমার মন ও আত্মা আমার সাথে থাকে না। আমার দেহটাই শুধু নাচে, আত্মা মরে যায়।

আজ যখন আমাকে বলা হলো, মুশেল থেকে দু'জন উঁচুদরের মেহমান এসেছে তখন আমার আত্মার সাথে দেহটাও অবশ ও প্রাণহীন হয়ে গেল। আমার মাথা ঘুরে গেল। বমি আসতে লাগলো।'

সারা বললো, 'রাজরাজরার যুদ্ধ বিগ্রহের বিষয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই। তাদের নিরাপত্তা, বন্ধুত্ব, চুক্তি এসব ব্যাপারেও আমার কোন উৎসাহ নেই।

কিন্তু যখন আমার কানে এলো, মুশেল থেকে গুরুত্বপূর্ণ মেহমান এসেছে তখন আমার মনে এক অদ্ভুত ভাবনার উদয় হলো। আমার মনে হতে লাগলো, এই মুসলমানদের কারো

সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

আমার অনুভূতিতে বিচিত্র ভাব জেগে উঠতে লাগলো। মন বলতে লাগলো, তুমি এই মহফিলে নাচতে পারবে না, তুমি আজকের জলসায় যেয়ো না। এই মেহমানরা তোমাকে দেখলে পালিয়ে যাবে।'

'কেন?' জ্যাকব প্রশ্ন করলো, 'মুশেলবাসীদের সাথে তোমার কি সম্পর্ক?'

'সে কথা আমি বলতে পারবো না।' সারা বললো, 'আমি নিজেই তো নিজেকে বলতে ভয় পাচ্ছি, মুশেলবাসীদের সাথে আমার কি সম্পর্ক রয়েছে।'

'সারা!' জ্যাকব সারার হাত তার হাতের মধ্যে নিয়ে বললো, 'তুমি কেন নিজেকে আমার কাছে গোপন করছো? আমাকে বিশ্বাস করো। তোমাকে কি কোন কাফেলা থেকে ধরে এনেছে? তুমি কি কোন মুসলমান পিতার সন্তান?'

সারা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলো না। জ্যাকবের প্রশ্ন শেষ হলে মুহূর্তে নিরবতা গ্রাস করে নিলো অন্ধকার কক্ষটি। হঠাৎ দু'জনেই চমকে উঠলো। জানালার দিকে মুখ করে বসেছিল দু'জন। খোলা জানালায় একটি ছায়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। সারা জ্যাকবের কানে কানে বললো, 'জলদি পালংকের নিচে যাও।'

জ্যাকব অন্ধকারে পালংকের নিচে চলে গেল। সারাও নিরবে শুয়ে পড়লো।

'সারা।' জানালার কাছে দাঁড়ানো ছায়ার কণ্ঠ। কণ্ঠটি বুড়ি

সর্দারনীর।

এখানে যারা থাকে তাদের দেখাশোনা করে এ বুড়ি। রাতে নাচের মাহফিলে সবাই গিয়েছে কিনা, মেয়েরা গান বাজনার চর্চা ঠিক মত করে কিনা, কোন মেয়ে পুরুষ বন্ধুকে অসময়ে ঘরে নিয়ে আসে কিনা এসবই দেখভাল করার দায়িত্ব এ বুড়ির।

সারা এ ডাকের কোন উত্তর দিল না। বুড়ি তাকে আরেকবার ডাকলো। সারা এবারও কোন জবাব দিল না। বুড়ী এবার আদেশের সুরে বললো, 'সারা, আমি জানি তুমি ঘুমাওনি। উত্তর দাও প্রদীপ কেন নিভে গেছে?'

সারা মুখ থেকে এমন শব্দ বের করলো যেন কোন আওয়াজ পেয়ে এইমাত্র ঘুম ভাঙল তার। সে হুড়মুড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলো এবং ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, 'কে, কে তুমি?'

'সারা, আমি।' বুড়ি বললো, 'তোমার বাতি নেভানো কেন?'

'কি জানি, হয়তো বাতাসে নিভে গেছে।'

বুড়ি জানালা থেকে সরে দরজার দিকে এগুতে এগুতে বললো, 'দাঁড়াও, আমি দেখছি।'

সারা তাড়াতাড়ি ঝুঁকে জ্যাকবকে বললো, 'ও সামনের দিকে গেছে, দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে। তুমি বেরিয়ে এসো এবং দ্রুত জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালাও।'

'না!' জ্যাকব নিচ থেকে বেরিয়ে এসে বললো 'আমি

তাকে জানি, তাকে আসতে দাও। আমি তার গরম ভাব নরম করে দেবো। সে বাধ্য হয়ে মুখ বুঁজে চলে যাবে।'

'এ মহিলা জঘন্যতম, তুমি তাকে চেনো না।' সারা বললো, 'এ মহিলা গোপনে মেয়েদের দালালী করে। তুমি জলদি এখান থেকে পালাও। নইলে আমার মিথ্যা আমাকেই আহত করবে। তুমি যাও, আমি তাকে সামলে নিতে পারবো।'

মহিলাটি ততক্ষণে দরজার কাছে এসে গেছে। সারার অনুনয় দাগ কাটলো জ্যাকবের হৃদয়ে। সে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

সারা বিছানা থেকে নেমে বাতি জ্বাললো। মহিলা প্রবেশ করলো কামরার ভেতরে।

এ মহিলা বড় জাদরেল নারী। নারীসুলভ কমনীয়তার পরিবর্তে পুরুষের মত কর্কশ কণ্ঠে সে বললো, 'বলো এ ঘরে কে এসেছিল?'

সারা যতই তাকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করলো যে তার কামরায় কেউ আসেনি ততই তার মেজাজ আরো তিরিক্ষে হয়ে উঠলো। সে সারার উপর বজ্রের মত আক্রোশ ঢেলে বললো, 'আমি নিজের চোখে কি ভুল দেখলাম?'

'হয়তো অন্ধকারে আপনার চোখ ধাঁধাঁ দেখেছে।'

'চোখ না হয় ধাঁধাঁ দেখলো কিন্তু কানে যে শুনলাম? সে শব্দ তো কোন নারীর কণ্ঠ নয়।'

মহিলা বাতি নিয়ে ঘরের চারদিকে দেখতে লাগলো। পালংকের নিচে ঝুঁকে সেখান থেকে একটা রুমাল বের করে

বললো, 'এটা কি?'

রুমালটা দৈর্ঘে প্রস্থে প্রায় এক গজ। অনেকটা গামছার মত। সাধারণত পুরুষরা গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ ধরনের রুমাল ব্যবহার করে।

'এটা কার? এটাতো তারই যে তোমার কাছে এসেছিল। বলো সে কে? আর তুমি তার কাছ থেকে কত মূল্য আদায় করেছো?'

'দেখো আমি পতিতা নই।' সারাও এবার রেগে গেল। 'তুমি ভাল করেই জানো আমি নর্তকী হলেও কোন পুরুষের সাথে সম্পর্ক রাখি না।'

'সারা, শুনে নাও!' বুড়ী তার আরও কাছ ঘেঁষে তার কাঁধের উপর হাত রেখে বললো, 'এটা আমি ভাল করেই জানি, তুমি এক নর্তকী। কিন্তু তুমি হয়তো জানো না, নর্তকীরা কোন দিন সেনাবাহিনীর জেনারেল হতে পারে না কিংবা কোন দেশের শাসকও হয় না।

আমি শুধু তোমাকে এটুকুই বলবো, রাতে তোমার কাছে যে লোক এসেছিল সে বৈরুতের পতিতালয়ের কোন নামকরা খদ্দেরের চেয়ে বড় কেউ নয়। তুমি তার পরিচয় বলে দিলে আমি তাকে যখন তখন কারাগারে বন্দী করতে পারি। তুমি রাজ দরবারের একজন নামী দামী নর্তকী। কিন্তু এটাও তুমি ভাল করেই জানো, এখানে তোমার নিজস্ব কোন ঠিকানা নেই।'

'বুঝলাম, এখন তুমি তোমার মনের কথা বলো।' সারা

বললো, 'তুমি আমার উপর যে দয়া করতে চাও তার বিনিময়ে কি নিতে চাও? আমি এখনই সে মূল্য পরিশোধ করবো।'

'আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই চাই না। তুমি দিলেও আমি তা নেবো না। বখরা আমি নেই ঠিকই, তবে সবার কাছ থেকে নয়। বরং তুমি যদি চাও তবে আমিই তোমাকে মূল্যবান উপঢৌকন দিতে পারি।'

'তাহলে তুমি কি চাও? তোমার আসল মতলবটি দয়া করে আমাকে খুলে বলো।'

'বলবো, সবই বলবো। না বললে চলবে কেন? আমি এমন এক সুখবর তোমাকে দেবো, যাতে আর কোনদিন সামান্য পুরুষের হাতে তোমাকে পড়তে না হয়।'

সারা তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলো। বাইরে থেকে যেসব শাহী মেহমান আসে তাদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করে এই মহিলা। এই মেহমানদের মধ্যে খৃস্টানও আছে, মুসলমানও আছে। এই সব মেহমানদের মনোরঞ্জনের জন্য নির্দিষ্ট মেয়েরা প্রস্তুত হয়েই থাকে।

কিন্তু এই মেহমানদের সাথে যে রক্ষী ও অন্যান্যরা থাকে তাদের সে রকম আমোদ ফুর্তির জোগাড় হয় না। এই মহিলা তাদের সাথে দেখা করে তাদের কাছে পছন্দ মত মেয়ে সরবরাহ করে প্রচুর অর্থ পায়। এটা তার গোপন কারবার।

বিভিন্ন শাহী মেহমান এমনও থাকে যে, সরকারীভাবে দেয়া মেয়েদের দ্বারা তৃপ্ত হয় না। এই মহিলা গোপনে তাদের সাথেও যোগাযোগ করে।

এ জন্য মহলের চাকর চাকরানীদের নিয়ে আছে তার একটি নিজস্ব বাহিনী। এ চক্রের মাধ্যমে সে মেহমানদের অভাব পূরণ করে দিয়ে যথোচিত পুরস্কার লাভ করে।

সারাকে এ চক্রে কোনদিন টানতে পারেনি মহিলা। এখন সুযোগ বুঝে সে ফাঁদেই তাকে ফেলতে চাচ্ছে বুড়ি।

সারা ভাবছে, এখন যদি সে বলে, আমার কাছে জ্যাকব এসেছিল, তার সাথে আমার সম্পর্ক খুব পবিত্র, সে কথা এ দালাল মহিলা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। এর ফল হবে ভয়ানক খারাপ। জ্যাকবকে কারাগারে পাঠিয়ে তার উপর চালানো হবে কঠিন অত্যাচার ও জুলুম। চাই কি এ অত্যাচারে সে মারাও যেতে পারে।

'সারা!' মহিলাটি বললো, 'যদি তুমি ভয়াবহ পরিণাম থেকে বাঁচতে চাও তবে আমার কথা মেনে নাও। বাইরে থেকে দু'জন মেহমান এসেছেন। তারা খুবই ধনী লোক। পরশু থেকে তারা চাকরদের বলে আসছে, তাদের জন্য যেন খুব ভাল মাল আমদানী করা হয়।

এটা মাতালদের স্বভাব। এরা তাদের হেরেমে বিশ ত্রিশটা মেয়ে একত্রিত করেও তৃপ্ত হয় না। তারা চায়, নিত্য নতুন রূপসীরা তাদের সামনে দিয়ে আনাগোনা করুক। কাল তুমি এদের একজনের কাছে যাবে।'

'সে জন কে?' সারা জিজ্ঞেস করলো, 'যদি মুসলমান হয় তবে তার কাছে আমি যাবো না।'

'তবে কারাগারে যাও।' মহিলা বললো, 'এখনও ভেবে

দেখো। তুমি তোমার নিজের অবস্থান চিন্তা করো। তুমি কি! তোমার পেশাটা কি! এখানে ভদ্র পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করবে না। আমার প্রস্তাব মেনে নাও। সে লোক তোমাকে মন খুলে পুরস্কার দেবেন। তার মধ্যে আমারও কিছু অংশ থাকবে।'

'যদি ধরা পড়ে যাই তখন কি হবে?'

'যারা ধরবে তাদের মুখ আমি বন্ধ করে দেবো।' মহিলা বললো, 'আগামীকাল রাতে প্রস্তুত থাকবে। তোমাকে আর কখনও জিজ্ঞেস করবো না, তোমার কাছে আজ রাতে কে এসেছিল।'

মহিলাটি এই বলে চলে গেল। পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে বিছানায় বসে রইল সারা। তার দু'চোখ বেয়ে তখন অশ্রুর বন্যা বইছে।

জ্যাকব পালিয়ে যাবার মত লোক ছিল না। কিন্তু সারার অনুনয়ে এই ভয়ে সে বের হয়ে গিয়েছিল যে, সারার উপর যেন কোন বিপদ না আসে। তার আশা ছিল, সারা তো এই পচা ডোবারই মেয়ে, সে মহিলাটিকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারবে।

জ্যাকব ফিরে যাচ্ছিল। তবে তার মন জুড়ে ছিল সারার ছবি। সে বুঝতে পারছিল, সারার সাথে তার এই আন্তরিক ভালবাসাকে অস্বীকার করার সাধ্য তার নেই। আর সে এটাও বুঝতে পারছিল, সারা কোন মুসলমানেরই কন্যা।

সে যেতে যেতে শহরের এক সংকীর্ণ গলির মধ্যে প্রবেশ করলো। গলির মোড় ঘুরে সামান্য এগিয়ে এক বাড়ীর সামনে

গিয়ে থামলো জ্যাকব। নির্দিষ্ট সংকেত অনুযায়ী দরজায় করাঘাত করলো। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে কেউ একজন বললো, 'কে?'

'আমি হাসান!' জ্যাকব উত্তর দিল।

'এত রাতে!' বিস্মিত হয়ে দরজায় দাঁড়ানো লোকটি বললো, 'কোন খারাপ খবর! জলদি ভেতরে এসো। কেউ দেখে ফেলেনি তো?'

'না।' জ্যাকব উত্তর দিল, 'সম্রাটের দরবার থেকে একটু আগে ছুটি পেলাম। একটি জরুরী খবর নিয়ে এসেছি।'

সে ভেতরে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটি। সে এখন আর জ্যাকব নয়, হাসান ইদরিস সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর এক জানবাজ গোয়েন্দা। এক বছর আগে নিজের নাম পরিবর্তন করে খৃস্টান নাম গ্রহণ করেছিল সে। গিলবার্ট জ্যাকব নাম নিয়ে ভর্তি হয়েছিল খৃস্টান সৈন্য বিভাগে।

এ যুবকের গায়ের রঙ উজ্জ্বল ফর্সা। কথাবার্তায় চটপটে। প্রশস্ত বক্ষ। সুন্দর স্বাস্থ্য। চোখে সারল্য আর মমতা মাখামাখি হয়ে আছে।

ট্রেনিংয়ে সে যথেষ্ট নৈপুন্য ও দক্ষতা প্রদর্শন করে। তার অভিনয় গুণের কথা অন্যরা না জানলেও সে ভালই জানতো। ট্রেনিং শেষে সহজেই সে মহলের নিরাপত্তা বিভাগে নিয়োগ পেয়ে যায়। ওখান থেকে সে নিয়মিত কায়রোতে সংবাদ ও তথ্যাবলী পাঠাতে লাগলো। তাদের গ্রুপ লিডার হাতেম আলী

এখন এ বাড়ীতেই থাকে। তার মত মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করছে তারা গোপনে তার সাথে যোগাযোগ রাখে।

'মুশেলের দু'জন দূত সম্রাট বিলডনের কাছে এসেছে।' হাসান তার লিডারকে বললো, 'আমার বিশ্বাস এরা মুশেল থেকেই এসেছে আর দু'জনই মুসলমান। তাদের দু'জনকে বিলডন তার খাস কামরায় নিয়ে যায়। সেখানে কি আলাপ হয় তা আমি শুনতে পারিনি, তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারা মুশেলের শাসক ইয়াজউদ্দিনের কোন পয়গাম নিয়ে এসেছে।'

'ওরা সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে খৃস্টানদের সাথে কোন গোপন চুক্তি করতে এসেছে।'

লিডার বললো, 'তাহলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সুলতান আইয়ুবী এখন পর্যন্ত ধোঁকায় পড়ে আছেন। তিনি ভাবছেন, ইয়াজউদ্দিন ও ইমামউদ্দিন তার অনুগত ও বন্ধু। তিনি জানেন, তারা আর কিছু উপকার না করুক তার বিরুদ্ধে যাবে না। এখন এটা জানা প্রয়োজন যে, তাদের সাথে খৃস্টানদের কি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?'

'তাদের কথাবার্তা বন্ধ কামরায় হয়েছিল, ফলে এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।'

হাসান বললো, 'তবে আমার মনে হয়, যা চুক্তি হওয়ার তা হয়ে গেছে। আমি তাদের একজনের সাথে কথা বলেছি। তাকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। হতভাগা মদ এমনভাবে পান করেছিল যে সে নেশার ঘোরে আমাকে স্পষ্ট বললো, তারা

দু'জনই মুসলমান এবং তারা মুশেল থেকে এসেছে। আমাকে বলছিল, 'তোমাদের খৃষ্টানদের ভালবাসা দেখতে চাই।' সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। মদের নেশায় এক সময় মাটিতে পড়ে গেল।'

'ঠিক আছে, আমি সুলতান আইয়ুবীকে এখন এ সংবাদটুকুই পাঠিয়ে দেই যে, বৈরুতে মুশেলের দুই দূত এসেছে।'

হাতেম আলী বললো, 'আমরা আমাদের সুলতানের কাছে খুবই লজ্জিত যে, তার কাছে এখনও আমাদের কোন সংবাদ পৌঁছলো না। তিনি বৈরুত অবরোধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি প্ল্যান পরিবর্তন করতে বাধ্য হন এ কারণে যে, তার পরিকল্পনার খবর বৈরুতে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল।'

'এতে আমাদের কোন ত্রুটি ছিল না।' হাসান বললো, 'ইসহাক তুর্কীকে যথাসময়ে পাঠানো হয়েছিল। সে ছলনা করার মত লোক নয়। হয়তো রাস্তায় সে মারা গেছে নয়তো ধরা পড়ে গেছে, যে কারণে সে কায়রোতে খবর পৌঁছাতে পারেনি।'

'বৈরুতের অবরোধে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর যে ক্ষতি হয়েছে, আমাদের সে ক্ষতি পুষিয়ে দিতে হবে।'

হাতেম আলী বললো, 'তার জন্য এ সংবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, মুশেলের শাসক খৃস্টান সম্রাট বিলডনের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি করেছে। কিন্তু এটুকু খবরই তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়। আমাদেরকে এ চুক্তির পূর্ণ বিবরণ তাকে দিতে হবে। চুক্তিতে

কি কি শর্ত আরোপ করা হয়েছে এবং তারা কি প্ল্যান করেছে সব জানতে হবে আমাদেরকে।

সুলতান এখন নিশ্চিন্তে আছেন এই ভেবে যে, তিনি বন্ধুদের মধ্যেই নিরাপদে অবস্থান করছেন। কিন্তু তিনি যে আসলে শত্রুদের দ্বারা বেষ্টিত আছেন এবং শত্রুদের মাঝেই ক্যাম্প করে বসে আছেন এ খবর তাঁর জানা নেই।'

হাতেম আলী হাসানকে জিজ্ঞেস করলো, 'মহলে কি তুমি এমন কোন মাধ্যম তৈরী করতে পারো না যাকে দিয়ে এ চুক্তির শর্ত ও পরিকল্পনা জানা যায়?'

ওরা কথা বলছিল ভেতরের কামরায় বসে। কামরার দরজা বন্ধ। হাসান উত্তর দিল, 'বিলডন বা তার উপদেষ্টা ও সেনাপতিদের কাছে এ কথা জিজ্ঞেস করা সম্ভব নয়। অথচ এ খবর ওদের মনের সিন্ধুকে বন্দী। এর বাইরে এ খবর জানে আর দু'জন, যারা মুশেলের দূত হয়ে এসেছে। এদের কাছ থেকেই আমি খবরটা বের করে নেয়ার একটা না একটা উপায় বের করে নেবো ইনশাআল্লাহ।'

'যদি তোমার চেষ্টা সফল না হয় তবে অন্য পথ অবলম্বন করতে হবে। ওরা যখন ফিরে যাবে তখন তাদেরকে রাস্তায় পাকড়াও করতে হবে। প্রয়োজন হলে ওদের খুন করবো কিন্তু এ তথ্য বুকে নিয়ে ওদের আমি মুশেল ফিরে যেতে দেবো না।'

'ওদেরকে হত্যা করলে তো আমাদের সমস্যা দূর হবে না।'

হাতেম আলী বললো, 'আমাদেরকে জানতেই হবে বিলডন ও ইয়াজউদ্দিনের মাঝে কি পরিকল্পনা ও চুক্তি হয়েছে।'

'আমি সে চেষ্টাই করবো।' হাসান বললো, 'যদি তাদের পরিকল্পনার সংবাদ না পাই তবে কি তাদের হত্যা করবো?'

'তাদের হত্যা করা এখন খুব জরুরী নয়, জরুরী হচ্ছে তথ্য। আগে তুমি সে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করো। প্রয়োজন হলে যে কোন সময় তাদেরকে হত্যা করা যাবে।'

হাতেম বললো, 'আর শোন, এ কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধা করতে হবে। পারলে আজ রাতেই তা সংগ্রহ করো, যাতে আগামী কাল সকালে যাকে সুলতান আইয়ুবীর কাছে পাঠাবো সে পূর্ণ সংবাদ নিয়ে যেতে পারে। আর যদি তা না পারো তবু সকালে আমি কাসেদ পাঠাবো। তখন শুধু বলবো, সম্রাট বিলডনের কাছে ইয়াজউদ্দিনের দু'জন দূত এসেছে। তাদের মাঝে সামরিক চুক্তি সাক্ষরিত হয়ে গেছে। চুক্তির শর্তাবলী পাওয়ার সাথে সাথেই আপনাকে জানাবো। এখন শুধু জেনে রাখুন, ইয়াজউদ্দিন আপনার বন্ধু নেই। আপনি এখন বন্ধুবেশী শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে আছেন।'

'ঠিক আছে, আমি তাহলে এখন যাই।'

'যাও, তবে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই পুরো সংবাদ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করো। সাবধান থেকো।'

'আপনি আমার সফলতার জন্য দোয়া করুন।' হাসান উঠে বেরিয়ে গেল।

'খৃষ্টান কমান্ডোদের জীবিত ধরার চেষ্টা করো।' সেনাপতি সালেম মিশরী তার কমান্ডো বাহিনীর কমান্ডোদেরকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তিনি তাদের বললেন, 'কিন্তু তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার পথ ঠিক রেখে আক্রমণ করতে চেষ্টা করবে। যেখানে আক্রমণ চালাবে সেখানে কঠিন আঘাত হানবে, একই সাথে সেখান থেকে বের হয়ে আসার পথও নিরাপদ রাখবে।

আর যদি তোমাদের উপর আক্রমণ আসে তবে তোমরা মূল বাহিনীকে সংবাদ দেবে। আমাদের বিশাল বাহিনী শুধু তোমাদের পাহারায় বিশ্রাম করছে। আর এত বিশাল পরিমাণ খাদ্য শস্য ও রসদ সম্ভার সবই তোমাদের দায়িত্বে আছে। অতএব সর্বদা সতর্ক পাহারা জোরদার রাখবে।'

কমান্ডো বাহিনীর দায়িত্ব সম্পর্কে কমান্ডোদের পুরোপুরি জ্ঞান ছিল।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তাঁর ক্যাম্প থেকে দূরে পাহাড়ী উপত্যকার উঁচু স্থানে ত্রিশ চল্লিশজন সৈন্যের একটি বিশেষ চৌকি স্থাপন করলেন। সেখান থেকে ওরা চারদিকে সতর্ক নজর রাখতে পারতো এবং নিজেদের বিশাল বাহিনীর তৎপরতাও দেখাশোনা করতে পারতো।

এ চৌকিটা ছিল পাহাড়ের ঠিক মাঝামাঝি। চারদিকে টিলা পরিবেষ্টিত। তাদের পিছনে উঁচু উঁচু পাহাড় শ্রেণী এবং একটি প্রশস্ত মাঠ। এই ময়দানের মধ্য দিয়ে সৈন্যরা চলাফেরা

করতো।

সহজে যাতে শত্রুর নজরে না পড়ে সে জন্যই তিনি এমন একটি স্থান বেছে নিয়েছিলেন। সেখানে সর্বদা দু'জন অশ্বারোহী প্রস্তুত অবস্থায় থাকতো।

এক সন্ধ্যায় সে ফাঁড়িতে অদৃশ্য থেকে কয়েকটি তীর ছুটে এলো এবং দু'জন মুজাহিদ তাতে শহীদ হয়ে গেল। কিন্তু অনেক তালাশ করেও কোত্থেকে এই তীর এলো তার হদিস বের করা গেল না।

পর পর তিন চার দিন ধরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। সূর্য ডোবার পর পরই অকস্মাৎ ছুটে আসে তিন চারটা তীর। তারপর আর কোন ঘটনা নেই। ইতিমধ্যে এই তীরে আরো একজন মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেল।

এরপর দু'তিন দিন আর কোন ঘটনা নেই। এক সন্ধ্যায় তিন চারটি তীর এসে বিদ্ধ হলো এক ঘোড়ার পিঠে আর ঘোড়াটি ছটফট করতে করতে মারা গেল।

তীর আশপাশের কোন পাহাড়ের আড়াল থেকেই আসতো। কিন্তু একটু পরই ঘোর অন্ধকারে ছেয়ে যেতো পাহাড়শ্রেণী। তাই তীর চালানো লোকদের খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে যেতো।

একদিন সন্ধ্যার একটু আগে ফাঁড়ির দুই সৈন্য পাহাড়ের পাশে এক গোপন জায়গায় গিয়ে বসে রইলো। উদ্দেশ্য কোত্থেকে তীর আসে তার হদিস বের করা।

সূর্য সবে ডুবতে বসেছে, দুটি তীর ছুটে এলো। অভ্যর্থ

নিশানা। দুটি তীরই দুই সৈন্যের পিঠে এসে বিদ্ধ হলো। তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই শহীদ হয়ে গেল। সকালে তাদের অর্ধ খাওয়া লাশ উদ্ধার করা হলো। রাতে নেকড়ে বাঘ বা পাহাড়ি শেয়াল লাশ দুটো খেয়ে গেছে।

এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, এই হামলা খৃস্টান কমান্ডোদের দ্বারাই হচ্ছে। কিন্তু কোন খৃস্টান সৈন্য তারা আশপাশে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলো।

একদিন দশ বারোজন সৈন্যের একটি দলকে সেই এলাকায় অনুসন্ধানের জন্য পাঠানো হলো। পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে তারা তিন চার গ্রুপে ভাগ হয়ে গেল। এক স্থানে দশ বারো বছরের এক শিশুকে দেখতে পেল একটি দল। ছেলেটি সৈন্যদের দেখেই দৌড়ে এক উঁচু পাহাড়ের গর্তে লুকিয়ে গেল।

ওরা ভাবল, ছেলেটি হয়তো রাখাল বালক। কিন্তু আশেপাশে কোন ছাগল বা উট দেখতে পেল না ওরা। সৈন্যরা যেখানে গিয়ে ছেলেটি দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিল সেখানে গেল। সেখানে পাহাড়ের গায়ে সরু একটা গর্তের মুখ। এটা কোন পর্বত গহবর হতে পারে। ছেলেটা নিশ্চয়ই এরই মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

সৈন্যরা গহবরের মুখে কান লাগিয়ে ভেতরের শব্দ শোনার চেষ্টা করলো। ভেতর থেকে মানুষের গলার স্বর শোনা গেল। সৈন্যদের দেখে কোন ছেলের গর্তে ঢুকে পড়া কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। এই সৈন্যরা ছেলেটির কাছে থেকে খৃস্টানদের

কমান্ডো বাহিনী সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা জানতে চাচ্ছিল। তারা ছেলেটিকে অনুরোধ করলো গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে। তারা তাকে নানা রকম অভয় দিল, কিন্তু ছেলেটি গর্ত থেকে বেরোলো না। তার পরিবর্তে গর্তের মধ্যে পরিপূর্ণ নিরবতা ছেয়ে গেল।

এবার সৈন্যরা হুমকি দিল, 'ভেতরে যে বা যারাই থাকো বের হয়ে এসো, নইলে সবাইকে হত্যা করা হবে।'

হুমকিতে কাজ হলো। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক মধ্য বয়সী মহিলা। সে তার নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় সৈন্যদের গালিগালাজ করতে লাগলো। পরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললো, 'তোমরা আমাকে হত্যা করো। আমার ছেলেকে ক্ষমা করে দাও।'

মেয়েটির কোলে এক শিশু, পেছনে দশ বারো বছরের আরেকটি ছেলে।

সৈন্যরা তাদের বুঝালো, 'আমরা মুসলমান। তোমাদের কোন ভয় নেই। আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করবো না। কিন্তু তুমি বলো, তোমার এ অবস্থা কেন? লোকালয় ছেড়ে এই পাহাড়ের গুহায় তুমি কি করছো?'

মেয়েটি এবার কান্নায় ভেঙে পড়লো। সে অনেক কাকুতি মিনতি করে বললো, 'আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা এখান থেকে চলে যাবো।'

'কিন্তু তার আগে তোমাকে বলতে হবে তুমি এখানে কি করে এলে? কেন এলে?'

সে কাঁদতে কাঁদতে যা বললো তার মানে দাঁড়ায় এ রকম: কয়েক দিন আগে তাদের গ্রামে পনেরো ষোলজন খৃস্টান সৈন্য এসে গ্রাম দখল করে নেয়। তারা গ্রামের সব কটা বাড়ীতে তল্লাশী চালিয়ে শিশু, যুবক, বৃদ্ধ ও গ্রামের সমস্ত মেয়েদের এক স্থানে একত্রিত করে সবার চোখের সামনে কয়েকজন যুবককে হত্যা করে। তারপর তারা বলে, 'যদি কেউ আমাদের হুকুম অমান্য করো তবে তার অবস্থা এরকমই হবে।'

তারা আরো বলে, 'আমরা এখানে আছি এ সংবাদ যেন কোন প্রকারে গ্রামের বাইরে না যায়। কেউ যেন না জানে এখানে বাইরের সৈন্য রয়েছে।'

তারপর তারা ঘোড়ার রাখালির দায়িত্ব গ্রামবাসীদের উপর ন্যস্ত করে নিজেরা গ্রামে আশ্রয় নেয়।

মেয়েটি বললো, 'কথা শেষ করে তাদের কমান্ডার তলোয়ার বের করলো। আমার স্বামী তার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। কমান্ডার আমার স্বামীকে বাহু ধরে সামনে টেনে নিলো এবং তলোয়ারের এক আঘাতে তার শিরচ্ছেদ করলো। তারা গ্রামবাসীদের বললো, 'যদি কেউ আমাদের আদেশ মানতে অস্বীকার করো তবে তার শাস্তি এমনটিই হবে।'

সে আরো জানালো, 'এই সেনারা তিনটি বাড়ী খালি করে সেখানে অবস্থান নেয়। গ্রামের মেয়েদের বাধ্য করে তাদের খেদমত করতে। আমি রাতে সুযোগ পেয়ে বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

'সৈন্যরা কি এখনো সে গ্রামে আছে?' প্রশ্ন করলো এক

সিপাই।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বললো, 'জানি না।'

মেয়েটির কাছ থেকে সৈন্যরা জেনে নিল গ্রামটির নাম ও অবস্থান। গ্রামটি সেখান থেকে কাছেই ছিল। সৈন্যরা মহিলা ও বাচ্চা দুটিকে সেখানে রেখে সেই গ্রামের দিকে চলে গেল।

পাহাড়ী এলাকায় টিলার সারি শেষ হলো। শুরু হলো বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এ প্রান্তরের শেষ মাথায় ছোট্ট একটি গ্রাম। ওখানে বড়জোর পনেরো বিশ ঘর লোকের বাস।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর প্রহরারত সৈন্যরা সকলেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহী ছিল। সংকেত দিয়ে অন্য গ্রুপগুলোকে ওখানে একত্রিত করলো ওরা। তারপর অতর্কিতে সেই গ্রামের উপর আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

সৈন্যরা গ্রামের কাছাকাছি চলে এলো। মেয়েটি সত্যি কথাই বলেছিল, খৃস্টান কমান্ডোরা সত্যি ওই গ্রাম দখল করে নিয়েছিল। তারা সেখানে পাহারা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।

অশ্বারোহীদের দেখেই সমস্ত খৃস্টান সৈন্য ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এলো। তাদের সামনে দাঁড় করালো মেয়ে ও শিশুদের।

অশ্বারোহীরা কাছাকাছি হলে একজন সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদের লক্ষ্য করে চিৎকার দিয়ে বললো, 'যদি তোমরা সামনে অগ্রসর হও তবে আমরা এই বাচ্চা ও মেয়েদেরকে হত্যা করবো।'

অশ্বারোহীরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে গেল। তারা খৃস্টানদের হাতে এতগুলো মুসলমান শিশু ও নারীকে খুন হতে দিতে পারে

না।

'ওরে কাপুরুষের দল!' সুলতান আইয়ুবীর কমান্ডো বাহিনীর কমান্ডার বললো, 'তোমরা যদি ক্রুশের জন্যই যুদ্ধ করতে এসে থাকো তবে পুরুষের মত সামনে এসে যুদ্ধ করো। শিশু ও নারীদের কেন ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছো?'

'তোমরা সবাই ফিরে যাও।' খৃস্টান কমান্ডার বললো, 'আমরাও গ্রাম ছেড়ে চলে যাবো। কথা দিচ্ছি আমরা আর এখানে থাকবো না।'

যে শিশু ও নারীদেরকে খৃস্টানরা আটকে রেখেছিল তাদের মধ্য থেকে এক মহিলা সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদের লক্ষ্য করে চিৎকার দিয়ে বললো, 'হে ইসলামের সৈনিকরা, তোমরা থেমে গেলে কেন? তোমরা আমাদেরকে অশ্বপদতলে পিষে মারো, কিন্তু এই কাফেরদের একটাকেও জীবিত ফিরে যেতে দিও না। আমরা শিশুসহ সকলেই মরতে প্রস্তুত।'

খৃস্টান কমান্ডার চোখের পলকে তলোয়ার বের করে আঘাত করলো মহিলার দেহে। দিখন্ডিত হয়ে লুটিয়ে পড়লো মহিলা। সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরাও সঙ্গে সঙ্গে তীর ধনুক হাতে নিল। তারা কোষ থেকে তীর বের করে নিশানা করতেই সমস্ত খৃস্টান সৈন্য শিশু ও নারীদের পিছনে বসে পড়লো।

'ওরে কাপুরুষের দল!' মুসলমান কমান্ডার বললো, সৈনিক কখনও শিশু ও নারীদের পিছনে লুকায় না।'

খৃস্টানরা একটা ভুল করলো, তারা শুধু সামনের দিকটাই লক্ষ্য করছিলো, কিন্তু পিছনে যে গ্রামবাসী পুরুষরা আছে

তাদের দিকে তাদের নজর ছিল না। এতক্ষণ এইসব পুরুষরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নির্বাক দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এক মহিলার রক্ত তাদের সচকিত করে তুললো।

এ সময় এক মহিলা তার তিন বছরের শিশুকে কোল থেকে আছাড় মেরে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'কাফেররা তো কাপুরুষ! তোমরা আমাদের খুন নিয়ে ভয় পাচ্ছো কেন? আমি আমার এই শিশুকেও কোরবানী দিতে রাজী আছি, তোমার ছুটে এসো। কাফেরদের পায়ের তলায় পিষে মারো। তোমরা ওদের ছেড়ে দিলেও ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে না। মরতে যদি হয় আমি এই খৃস্টান সৈন্যদের সঙ্গে নিয়েই মরবো।'

মহিলা পাশের এক খৃস্টান সৈনিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

খৃস্টান সৈন্যটি মহিলাকে হত্যা করার জন্য তলোয়ার উঠাচ্ছিল, কিন্তু সে সুযোগ সে পেল না। পিছন থেকে এক গ্রামবাসী ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নিল সৈনিকটির তলোয়ার। মুহূর্তে হাতাহাতি লড়াই বেঁধে গেল।

গ্রামবাসী হাতের কাছে যা পেলো তাই নিয়ে চড়াও হলো তাদের ওপর। খৃস্টান সৈন্যরা যেই গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ করতে গেল আইয়ুবীর অশ্বারোহীরা চিৎকার করে বললো, 'নারী ও শিশুরা পালিয়ে যাও। তোমরা সরে দাঁড়াও এক পাশে।'

মেয়েরা শিশুদের কোলে নিয়ে পালাতে লাগলো। গ্রামের লোকেরা ঘোড়ার সামনে থেকে সরে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণের

মধ্যে দুই খৃস্টান ছাড়া সমস্ত খৃস্টান সৈন্য নিহত হয়ে অশ্ব পদতলে মাংসের কিমা হয়ে গেল।

গ্রামবাসীরা সে দু'জনকেও হত্যা করতে চাইল। কিন্তু মুসলিম সেনা কমান্ডার তাদের বুঝালো, 'ওদের দু'জনের নিকট থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। জরুরী প্রয়োজনে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।'

এই দু'জন খৃস্টানকে নিয়ে সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হাসান বিন আব্দুল্লাহর কাছে সঁপে দেয়া হলো। তিনি তাদের প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের কমান্ডো দল কোথায় কোথায় আছে জলদি বলে দাও।'

তারা দু'জন জানতো এ প্রশ্নের জবাব না দিলে কি হবে। মিথ্যে তথ্য দিলে তার খেসারত কি হতে পারে তাও তাদের অজানা ছিল না। হাসান বিন আব্দুল্লাহ তাদের জেরা করে সমস্ত তথ্যই তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিলেন।

তারা স্বীকার করলো, সম্রাট বিলডন হাজারখানেক কমান্ডো সুলতান আইয়ুবীর সৈন্য ও খাদ্যশস্য ধ্বংস করার জন্য বৈরুত থেকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওদের এখনও কোন নির্দিষ্ট ক্যাম্প করার সুযোগ হয়নি। তারা সমস্ত এলাকায় গ্রুপ গ্রুপ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

তাদের বলা হয়েছে, তারা যেন ছোট ছোট গ্রাম দখল সেখান থেকে খাদ্যশস্য যোগাড় করে ও সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদলের ওপর চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে তাদের ক্ষতি সাধন করতে থাকে।

এই দু'জন খৃস্টান কমান্ডোকে সুলতান আইয়ুবীর সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি তাদের কথা শুনলেন, গ্রামের উপর অত্যাচার করার কথাও শুনলেন। সব শুনে তিনি আদেশ দিলেন, 'এদের দূরে কোথাও নিয়ে হত্যা করো। কারণ এরা খুনী। খুনের বদলে খুন ওদের পাওনা হয়ে গেছে।'

কমান্ডোদের দূরে সরিয়ে নেয়া হলো। তিনি তার সেনাপতিদের বললেন, 'এই ঘটনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল, খৃস্টান কমান্ডোদের মুশেলের কোন কেল্লাতে থাকার অনুমতি এখনো দেয়া হয়নি। সে রকম অনুমতি থাকলে ওরা এই গ্রামকে আড্ডা বানাতো না।'

সুলতান আইয়ুবী আদেশ দিলেন, 'আশপাশের প্রতিটি গ্রামে দু'চার জন করে কমান্ডো গোয়েন্দা পাঠিয়ে দাও। আর তাদের কঠোরভাবে নিষেধ করে দাও তারা যেন গ্রামে কারো কোন ক্ষতি না করে।'

তিনি কঠোর ভাষায় তাদের সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'তারা নিজেদের খোরাক ও ঘোড়ার খাবার নিজেরাই সংগ্রহ করে নেবে। প্রয়োজনে উপযুক্ত দাম দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করবে। কিন্তু কোন গ্রাম থেকেই খাদ্যের একটি দানাও যেন বিনা পয়সায় গ্রহণ করা না হয়।'

হাসান ইদরিস হাতেম আলীকে রিপোর্ট করে নিজের ঘরে ফিরে এলো। কিন্তু সে বাকী রাত ঘুমোতে পারলো না। তার

মনে শুধু সারার কথাই জাগছিল। তার বুঝতে বাকি রইল না, ঐ দাজ্জাল মহিলা সারার ওপর চড়াও হবে। তাকে এ জন্য কোন শাস্তি দেয় তাই চিন্তা করছিল হাসান।

সে জানতো এই মহিলা কে? কিন্তু সে ঐ মহিলার সাথে দেখা করে সারার জন্য কোন সুপারিশ করতে পারে না। কারণ সে তাকে বলতে পারবে না, আমিই সে রাতে সারার কামরায় গিয়েছিলাম।

সারার কথা ভুলে তার মনে জেগে উঠতো দায়িত্বের কথা। কেমন করে সে মুশেলের দূতের কাছ থেকে জেনে নেবে বিলডনের সাথে তাদের কি চুক্তি হয়েছে? এ গোপন তথ্য তো শুধু তার কাছ থেকেই নেয়া সম্ভব। তাদের গোপন বৈঠকে কোন চাকর চাকরানী ছিল না যে, তাদের কাছ থেকে হাসান কোন তথ্য উদ্ধার করতে পারবে।

একদিকে সারার চিন্তা অন্য দিকে মুশেলের দূতের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের ভাবনা তাকে অস্থির করে তুলল। সে অনেক ভেবেও কোন সমস্যারই কুলকিনারা করতে পারলো না।

'সারা!' তার মুখ থেকে সহসাই শব্দটি বের হয়ে গেল। অনিচ্ছাকৃতভাবে বের হলেও শব্দটি কানে যেতেই চমকে উঠলো হাসান। চিন্তার দিগন্তে নতুন আলো ঝিলিক দিয়ে উঠলো। হ্যাঁ, সারাই তো এ সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে!

মুশেল শব্দটি সারাকে যেভাবে নাড়া দিয়েছে তাতে ধরে

নেয়া যায়, সারার শৈশব কেটেছে মুশেলে। নিশ্চয়ই সারা মুসলমানের মেয়ে। সারা ইচ্ছে করলে সহজেই সে এ সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবে।

হাসান চিন্তা করে দেখলো, মুশেলের দূতকে বশীভূত করা সারার জন্য কোন ব্যাপারই না। মদ ও সৌন্দর্যের যাদুর ফাঁদে ফেলে তার মনের সকল গোপন কথা সহজেই জেনে নিতে পারবে সারা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সারা কি তা করবে? নাকি সারার মাধ্যমে এ তথ্য উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেই ধরা পড়ে যাবে?

মরু সাইমুমের মতই ভাবনার ঝড় বইছে তার মাথায়। একটা সিদ্ধান্তে তাকে আসতেই হবে। যে করেই হোক চুক্তির গোপন তথ্য বের করতে হবে তাকে।

সে জানে, গোয়েন্দাদের বিপদের ঝুঁকি নিতে হ । ঝুঁকি এখন তাকেও নিতে হবে। এ চেষ্টায় সফল হলে বি টি প্রাপ্তি ঘটবে। আর যদি ব্যর্থ হয়, যদি ধরা পড়ে যায় তবে তাকে পালাতে হবে এখান থেকে।

হয়তো পালাতে পারবে, হয়তো পারবে না। হয়তো ধরা পড়ে নিক্ষিপ্ত হবে কারাগারে অথবা পালাতে গিয়ে মারা যাবে। কিন্তু পিছু হটার উপায় নেই তার। ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে। হাসানকে এবার তার কথার নৈপুণ্য দেখাতে হবে। বশীভূত করতে হবে সারাকে।

সারার কথা ভাবতে গিয়েই তার মনে পড়লো, সারা অনেকবারই তাকে মুসলমান বলে সন্দেহ করেছে। সন্দেহ করার পরও সে তাকে পছন্দ করছে। সে নিজে থেকেই

বলেছে, মুসলমানদের আচার কানুন তারও পছন্দ। মুসলমানদের প্রতি এই দুর্বলতার একটাই কারণ হতে পারে যে, সে মুসলমান। যদি তাই হয় তাহলে সারা কিছুতেই তাকে ধরিয়ে দেবে না। হয়তো হাসানের আসল পরিচয় জানলে নিজের পরিচয়টাও প্রকাশ করতে পারে। এইসব ভাবতে ভাবতে হাসানের রাতটা পার হয়ে গেল।

হাসানের মস্তিষ্ক যখন চিন্তায় চিন্তায় ক্লান্ত তখন দূরের মসজিদ থেকে ভেসে এলো ফজরের আজান ধ্বনি। আল্লাহু আকবার ধ্বনি কানে বাজতেই সে বিছানায় উঠে বসলো। ভাবলো, যে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ধ্বনি ঘোষিত হচ্ছে মিনার থেকে সেই আল্লাহই আমাকে সাহায্য করবেন।

সে উঠে ওজু করলো। কামরার দরজা বন্ধ করে দিল এ জন্য যে, খৃস্টানদের দুনিয়ায় সে মুসলমান নয়, সেও এক খৃস্টান। বৈরুতে সে হাসান ইদরিস নয়, গিলবার্ট জ্যাকব।

ছোট্ট একটি কামরায় সে একাই থাকতো। সেখানে সুন্দর করে সাজানো ছিল হযরত ইসা (আঃ)-এর মূর্তি ও ক্রুশ। তার গলায়ও লটকানো থাকতো ক্রুশের প্রতীক। দেয়ালে লটকানো ছিল হযরত মরিয়মের কাল্পনিক আঁকা ছবি। এসবই সে খুলে খাটের নিচে রেখে দিল। তারপর দরজায় খিল এঁটে কেবলার দিকে মুখ করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেল।

সে প্রতিদিনই লুকিয়ে এমনিভাবে নামাজ পড়তো। তবে সব ওয়াক্ত পড়তে পারতো না। পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে অনেক সময়ই তাকে নামাজ কাজা করতে হতো।

আজ নামাজে দাঁড়ানোর পর তার হৃদয়তন্ত্রীতে যে আবেগের ঝড় উঠলো অতীতে এমন অবস্থা আর কখনো হয়নি। তার মনে হলো সে মহামহিম আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেই মহান আল্লাহ, যিনি সব পারেন। মানুষের এমন কোন সমস্যা নেই যা তিনি সমাধা করতে পারেন না। তিনিই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। তিনিই শোনেন দুর্বলের ফরিয়াদ। অসহায় বান্দার আরজু তিনিই মঞ্জুর করেন।

হাসানের দু'চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'ইয়াকানা'বুদু ওয়া ইয়াকা নাসতাইন– হে আল্লাহ, আমরা তোমারই ইবাদত করি আর তোমারই সাহায্য চাই।'

শব্দগুলো যখন সে উচ্চারণ করছিল তখন তার মনে হচ্ছিলো, আল্লাহ যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এত কাছে, সন্তানের মাথায় স্নেহের হাত বুলানোর সময় পিতা যেমন কাছে থাকে।

সে নামাজ শেষ করে দোয়ার জন্য হাত উঠালো। তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। তার মুখ থেকে নির্গত হতে থাকলো বিগলিত অনুনয় ধ্বনি, 'হে প্রথম কেবলার খোদা! আজ তোমার নামের তারিফ করার, তোমার প্রিয় রাসূলের শানে দরুদ পড়ার পরিবেশটুকুও বিলীন হয়ে গেছে। খৃস্টানদের ভয়ে তোমার প্রিয় বান্দারা আজ মসজিদুল আকসায় দু'রাকাত নামাজ পড়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত।

তোমার প্রিয় রাসুলের যারা উম্মত তারা আজ আত্মকলহে

লিপ্ত। অশ্লীলতার বন্যায় ভেসে যাচ্ছে সময়ের সাহসী সন্তানেরা। ক্ষমতার লোভে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে জাতির নেতৃবৃন্দ আমীর ও শাসকরা।

হে রাব্বুল আলামীন, যে মসজিদ তোমার প্রিয় হাবীবের পদস্পর্শে পাক ও পবিত্র হয়েছিল সেখানে কর্তৃত্ব করছে বিধর্মীরা। সেখানে এখন ক্রুশের কালো ছায়া আসন পেড়ে আছে। যে বনী ইসরাইলীদের অহমিকা তোমার বিধানকেও অস্বীকার করেছিল, সেই জাতি আজ তোমার প্রথম কেবলায় হযরত সোলায়মানের বিরাট মুর্তি বানিয়ে পুজা করছে।

হে আমার আল্লাহ! তুমি তোমার শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ দেখাও। তুমি তোমার কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাও। তোমার প্রিয় রাসুলের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দাও।'

কাতর কণ্ঠে মোনাজাত করে চলেছে হাসান ইদরিস, 'হে আল্লাহ, আমাকে তুমি সেই শক্তি দান করো যেন আমি তোমার ও তোমার রাসুলের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পারি। যেন আমি কোরআনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেখাতে পারি। ইহুদী ও খৃস্টানদের নাগপাশ থেকে যেন আমি তোমার প্রিয় হাবীবের স্মৃতিমাখা মসজিদুল আকসাকে উদ্ধার করতে পারি।

এই বৈরুতে নাসারাদের যে আধিপত্য বিরাজ করছে আমি যেন তা ভেঙ্গে মিসমার করে দিতে পারি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এই শক্তি ও সাহস দাও।'

হাসান ইদরিস কাঁদছে আর প্রার্থনা করছে, 'হে আমার রব, বায়তুল মুকাদ্দাস ও সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মাঝে যে

বাঁধা সৃষ্টি হয়ে আছে তা অপসারণ করার শক্তি আমাকে দাও। আমাকে তুমি অন্ধকারে আলোর পথ দেখাও। আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তুমি আমার সহায় হয়ে যাও।

তুমি আমাকে এমন কঠিন পরীক্ষায় ফেলো না যে পরীক্ষায় পাশ করার সাধ্য আমার নেই। আমি তোমার পথে জীবন কোরবানী করতে পারি, কিন্তু হে আল্লাহ, তুমি ওয়াদা করো যেন আমার কোরবানী বৃথা না যায়।

হে আল্লাহ! তোমার নামের ওপর শহীদ হওয়া সৈনিকদের এতিম সন্তানের কসম! আমাকে তুমি শক্তি, সাহস ও বল দান করো। আমাকে মদদ দাও যেন এই এতিমদের পিতার রক্তের প্রতিটি কণার প্রতিশোধ নিতে পারি।'

ভূমধ্যসাগরের বাতাসের মতই হু হু করে সময় বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই হাসানের। সে কাতর কণ্ঠে তখনো আল্লাহকে বলছে, 'তোমার রাসুলের উম্মতের সেই মায়েদের কসম, যে সব মেয়েদের সম্ভ্রম তোমার মসজিদুল আকসার মুক্তি ও পবিত্রতার জন্য লুণ্ঠিত হয়েছে। আমাকে সাহস দাও যেন কাফেরদের প্রতিটি কেল্লা মিসমার করে দিতে পারি।

তোমার পথের লড়াকু বীর মুজাহিদ গাজীদের কাতারে আমাকে শামিল করো। হেজাযের বীর বাসিন্দাদের সাহস ও হিম্মত দাও আমায়। আমাদের ভবিষ্যত বংশধররা যেন বলতে না পারে, ন্যায়, সত্য ও সততার জন্য আমরা লড়াই করিনি। তোমার দ্বীনের জন্য আমাদের অন্তরে আবেগ ও ভালবাসা ছিল

না।

প্রভু হে, আজ খৃস্টানদের বানানো মুর্তিগুলো তোমাকে উপহাস করছে। আমাকে সেই বীরত্ব দান করো যেন আমি পাথরের মূর্তিগুলো পদদলিত ও মিসমার করে প্রাণ খুলে হাসতে পারি।

হে আমার প্রভু! যদি তুমি এটাও করতে না পারো তবে আমার রক্তকে ঠান্ডা ও নিষ্ক্রিয় করে দাও। আমাকে এমন নির্লজ্জ অনুভুতিহীন বানিয়ে দাও যেন বুঝতে না পারি লজ্জা কি জিনিস। আমার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। আমি আর ইসলামের অপমান এবং মুসলিম মা-বোনদের সম্ভ্রম লুট হওয়া দেখতে চাই না। আমার কানকে তুমি স্তব্ধ করে দাও যেন আমি মজলুম মুসলমানদের ফরিয়াদ শুনতে না পাই।'

হাসানের আওয়াজ আস্তে আস্তে জোরালো হতে লাগলো। এক সময় তার কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এলো আর্তচিৎকার, 'হে আল্লাহ, তুমি কোথায়? বলো হে আল্লাহ, আমাকে ভাষা দানকারী খোদা তুমি নিজেই বলো, কোরআন সত্য নাকি ক্রুশ? কুরআন যদি তোমারই কথা হয়ে থাকে তবে সে কোরআনের জন্য আমাকে কবুল করে নাও।'

মোনাজাত তখনো শেষ হয়নি, হাসানের মনে হতে লাগল, বাইরে ভয়াবহ ঝড় বইছে। প্রচন্ড শব্দে যেন ছাদ ফেটে যেতে চাচ্ছে। মাটি কাঁপছে। সঙ্গে বিজলী ও বজ্রের কড়কড় শব্দ। যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে হাসানের কামরা। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিজলীর চমক।

হাসান আরো জোরে জোরে বলতে লাগলো, 'এই বিজলী দিয়ে আমাকে পুড়িয়ে দাও! আকসা মসজিদটাও পুড়িয়ে দাও, গুড়িয়ে দাও। যেন সেখানে কোন মুসাফির না থাকে, মঞ্জিলও না থাকে। বিজলী যেন তারই উপর পড়ে যার স্বামী তোমার নামে শেষ হয়েছে। তোমার নামের উপর যারা এতিম হয়েছে তাদের উপর বিজলী বর্ষণ করো। তোমার রাসুলের উম্মতের উপর বিজলী বর্ষণ করো, যাতে কেউ তোমার কাছে কোন অভিযোগ করতে না পারে।'

ক্লান্ত হাসানের কণ্ঠ কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে এলো। সে বলতে লাগলো, 'আমাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ্। যদি আমি কোন ভুল আবেদন করে থাকি সংশোধন করে দাও। যে আবেদন আমার করা উচিত সেই আবেদন এনে দাও আমার কণ্ঠে।'

বিজলী আবারও চমকে উঠলো। তারপর শুরু হলো মেঘের গর্জন ও বর্ষণ। হাসানের ওখান থেকে বৈরুতের সাগর তীর বেশী দূরে নয়। এ সময় সমুদ্র সাধারণত: নিরবই থাকে। কিন্তু তার মনে হলো সমুদ্র যেন রাগে ফুলে উঠেছে। ঢেউয়ের ভীষণ গর্জন যেন শুনতে পাচ্ছে হাসান।

ভূমধ্যসাগরের ক্রুদ্ধ তরঙ্গমালা যেন তার কামরায় এসে আঘাত হানছে। মেঘের গর্জন, বিজলীর চমক, বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার অশান্ত দাপাদাপিতে যেন কিয়ামতের প্রলয় শুরু হয়ে গেছে। এক সময় হাসান অনুভব করলো, প্রকৃতিতে নয়, এ প্রলয় শুরু হয়েছে তার অন্তরে।

সে তার ফরিয়াদের ভাষাকে আরো উচ্চকিত করলো। বলতে লাগলো, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার মধ্যে জযবার এমন তুফান দাও যেন আমি কাফেরদের সব চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি। আমার রক্তের স্রোত দিয়ে মসজিদুল আকসার আঙ্গিনা ধুয়ে মুছে পবিত্র করে দাও।

আমি বড়ই লজ্জিত খোদা, তোমার প্রথম কেবলার ভক্ত সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এখানে তার বাহিনী নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আফসোস, আমরা তাকে সতর্ক ও সাহায্য করতে পারিনি। তাকে বলতে পারিনি, বৈরুতে আপনার আগমন বার্তা আগেই পৌঁছে গেছে। তারা আপনাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ব্যাপক রণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আপনি বৈরুত থেকে দূরে থাকুন। এখানে কাফেররা আপনার জন্য ফাঁদ তৈরী করে রেখেছে।

সুলতানকে এ খবর পৌঁছাতে না পারাটা আমাদের দুর্বলতা, আমাদের অপরাধ। হে আল্লাহ, তুমি শক্তি ও সাহস দাও যাতে সে অপরাধের কাফফারা আদায় করতে পারি। নইলে এই মূর্তি ও ক্রুশ আমার আত্মাকেও অভিশাপ দেবে। এই মূর্তির সামনে তুমি আমাকে লজ্জিত করো না। তুমি শহীদদের আত্মার কাছে আমাকে লজ্জিত করো না। যদি আমার দোয়া কবুল না করো তবে আমাকে হাশরের ময়দানে জীবিত করো না।

হে খোদা! তোমার সামনে তোমার নামে অবিচারের অভিযোগ নিয়ে আমি দাঁড়াতে চাই না। সমস্ত মানুষ ও মাখলুকের সামনে বলতে চাই না, এই খোদা তার প্রিয়

রাসুলের সম্মান রক্ষা করেনি। এই খোদা রাসুলের অনুসারীদেরকে অসহায় ছেড়ে দিয়েছিল। তার বান্দারা যখন তার প্রথম কেবলাকে পবিত্র করার জন্য ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন তিনি তাদের সাহায্য করেননি।'

হাসানের মনে হচ্ছিল, বিজলী ও বজ্র এমন ভাবে চমকাচ্ছে ও গর্জন করছে যেন হাসানের কামরার ছাদ, দরজা জানালার পাল্লা জোরে খটখট করছে। ছাদের উপর দিয়ে যেন ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। মুসলধারে বৃষ্টি ও ঝড় বইছে। প্রলয় তুফানে আকাশ পাতাল কাঁপছে।

হাসানের মনে এবার ভয় ঢুকে গেলো। তার এমন আশংকা হতে লাগলো, যেন সে কঠিন এক দুর্যোগের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। আবার মনে হলো, সে স্বপ্নের মাঝে ডুবে আছে, স্বপ্নের ঘোরেই আবোল তাবোল বকছে।

সে জীবনে আল্লাহর কাছে এমন অভিযোগের স্বরে আর কোন দিন কথা বলেনি। চুপচাপ নামাজ পড়তো, সংক্ষিপ্তভাবে নামাজ শেষ করে আবার সে হাসান থেকে জ্যাকব হয়ে যেতো।

রাতে হাতেম আলীকে রিপোর্ট করে আসার পর থেকেই আবেগে সে খুব অস্থির ছিল। তার চোখে ঘুমের ভাবও ছিল না। দুশ্চিন্তায় পাগলের মত হয়ে যাচ্ছিল। মোনাজাত শেষ হতেই এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করলো সে। কিভাবে এ সমস্যার সমাধান হবে জানা নেই তার, তবু মনে হলো, সমাধানের কোন না কোন পথ বেরিয়েই আসবে। সে মাথা

থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে দিল।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বা আলী বিন সুফিয়ান কেউ এখনো জানেন না, ইয়াজউদ্দিনের দূত বিলডনের সাথে কি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। অথচ এ তথ্য জানা আইয়ুবীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সম্রাট বিলডনের দরবারে কি ঘটে, এখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র হয় এসব তথ্য সংগ্রহের জন্যই উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে তাকে এখানে নিয়োগ করা হয়েছে। এ জন্য তাকে নিয়মিত বেতন দেয়া হয়। সেই বেতনের টাকা সে বাড়ীতে তার মা বাবার জন্য পাঠিয়ে দেয়। বেতনের টাকা ছাড়াও বিদেশ বিভূঁয়ে গোয়েন্দাগিরী করতে গিয়ে উপরি আয় হয়। যেমন এখানে সম্রাট বিলডনের কোষাগার থেকেও সে বেতন পাচ্ছে। খরচবাদে সব টাকাই সে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়।

বৈরুতে সে ভাল পজিশনেই ছিল। সুখ স্বাচ্ছন্দে দিন কাটছিল তার। কিন্তু সে এক ঈমানদার মানুষ। নিজের দায়িত্বকে সে নামাজ রোজার মতই ফরজ মনে করে।

সে বিশ্বাস করতো, নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম না দিলে তার সব আয়ই হারাম কামাই হয়ে যাবে। দায়িত্বে অবহেলাকে সে অপরাধ মনে করতো।

সে বিশ্বাস করতো, দায়িত্বে অবহেলাই একটি জাতির পরাজয়কে অনিবার্য করে তোলে। তাই সে আপন দায়িত্বের ব্যাপারে এতটা অস্থির হয়ে পড়েছিল।

সারারাত নির্ঘুম কাটানোর ফলে ফজরের নামাজ ও

মোনাজাতের পর যখন তার মনে স্বস্তি ফিরে এলো তখন প্রচন্ড ঘুম পেল তার। সে জায়নামাজের উপরই ঘুমিয়ে পড়লো।

এভাবে ঘুমিয়ে পড়াটা তার উচিত হয়নি। স্বাভাবিক অবস্থায় সে এমনটি করতোও না। সে আগে জায়নামাজ লুকাতো। তারপর খাটের নিচে রাখা মেরীর মূর্তি, ছবি ও ক্রুশ যথাস্থানে রেখে জ্যাকবের সঠিক রূপ ধারণ করে তবে অন্য কাজে মন দিত।

কিন্তু আজ সারা রাতের দুশ্চিন্তা তাকে এতটাই কাবু করে ফেলেছিল যে, সে এসব গুছানোর কথা চিন্তাও করতে পারল না। নিজের অজান্তেই সে ঘুমের অতলে হারিয়ে গেল।

ঘুমের ঘোরে সে চলে গেল স্বপ্নের জগতে। তার সামনে মসজিদুল আকসা। এই মসজিদ সে একবার দেখেছিল যখন সে বায়তুল মুকাদ্দাসে গোয়েন্দা মিশনে গিয়েছিল।

মসজিদটি ছিল তখন তালাবদ্ধ, বিরান। একদিকের একটি খোলা দরজা নামাজীদের পথ পানে চেয়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা দূরের ছোট ছোট মসজিদ বা তাদের নিজ গৃহে নামাজ আদায় করতো।

খৃস্টান ও ইহুদী শিশুরা মসজিদের আঙ্গিনায় খেলা করছে। অসংখ্য ছেলে জুতা পায়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। খৃস্টানদের ভয়ে সেখানকার ভীত সন্ত্রস্ত মুসলমানরা মসজিদুল আকসার ধারেকাছেও যেতো না। হাসানের হৃদয়টা এ দৃশ্য দেখে হাহাকার করে উঠেছিল। হায়! মুসলমানদের প্রথম কেবলার আজ একি অবস্থা! মসজিদুল আকসার পবিত্রতা এভাবে নষ্ট

হচ্ছে?

আজ সে বৈরুতে। স্বপ্নের ঘোরে চলে গেছে বায়তুল মুকাদ্দাসে। সেখানে সে দেখতে পাচ্ছে নয়নাভিরাম বায়তুল মুকাদ্দাস। মসজিদের গম্বুজের উপর অসংখ্য কবুতর ও পাখীর ঝাঁক বসে আছে।

যদি একটি কবুতর আকাশে উড়াল দেয় সঙ্গে সঙ্গে কবুতরের ঝাঁক সঙ্গী হয় তার। মসজিদের গম্বুজ ঢেকে যায় কোমল ছায়ায়। এই ঝাঁক মসজিদের আশেপাশে চক্কর দিয়ে আবার এসে গম্বুজে বসে। হাসান ঘুমের ঘোরে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে দেখে এ নয়নাভিরাম দৃশ্য।

মুহূর্তে মিলিয়ে যায় এ দৃশ্য। হাসান দেখতে পায় মসজিদের ভেতর থেকে একদল খৃস্টান ও ইহুদী হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে। তাদের সবার কাপড়ে দাউ দাউ আগুন। তারা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে, চিৎকার ও আহাজারী করছে কিন্তু কারো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। আকাশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়ে বেড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিভিন্ন রংয়ের পাখি হয়ে গেল। তারা উড়ে উড়ে একে একে মসজিদের সবুজ গম্বুজের উপর বসতে লাগলো।

হাসান মসজিদে প্রবেশ করলো। এখন সেখানে কোন খৃস্টান বা ইহুদীর চিহ্নও নেই। হাসান মসজিদের দেয়ালগুলোর দিকে তাকালো।

দেয়ালগুলো যেন নীলের সামিয়ানা। জানালা পথে চোখ ফেলল বাইরে। কি সুন্দর নীলাকাশ। দিনের আলো নীল।

প্রকৃতির ছায়া নীল। মসজিদের দরজা দিয়ে গলে পড়ছে নীল আলো। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে তাতে। চারদিকে যেন নীলের উৎসব।

স্বপ্নের মাঝে স্বপ্ন এলো। এই স্বপ্নের মাঝেই হাসানের ঘুম ভেঙে গেল। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ওভাবেই পড়ে রইল হাসান। মনে করতে চেষ্টা করলো সে এখন কোথায়। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, সে ফজরের নামাজ শেষে মোনাজাত করছিল। কিন্তু ঘুম তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল যে, সে জায়নামাজ থেকে উঠারও সময় পায়নি, জায়নামাজেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

তার মাথায় তখনো আগুনের গোলা, পাখির উড়াউড়ি আর নীল আলোর ঝলকানি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চোখ খুললো সে। খুলেই আবার চোখ বন্ধ করে নিল। আবার খুললো। কোথায় নীল আলোর ঝলক, কোথায় আগুন, কোথায় পাখিদের উড়াউড়ি, সামনে শুধু এক নারী, সারা। তার ঠোঁটের কোণে ঝুলে আছে একটুকরো মিষ্টি হাসি।

হাসান বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলো। আপাদমস্তক চাঁদের মত উজ্জ্বল সাদা পোষাকে দাঁড়িয়ে আছে সারা। শুধু তার মুখ ও দুটি হাত দেখা যাচ্ছে। তার মুচকি হাসিটি বড় হলো। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো সাদা দাঁত, সে দাঁত এতই উজ্জ্বল যেন মুক্তোর মত ঝকমক করছে।

সারা তার একটি হাত সামনে প্রসারিত করে বললো, 'আমার হাত ধরো। আর কত ঘুমোবে? এসো, মসজিদুল

আকসায় প্রবেশ করি। মসজিদুল আকসা এখন আমাদের।'

হাসানের কানে তার সঙ্গীতময় কণ্ঠ বাজতে লাগল। সারা বলছে, 'এখন থেকে এই মসজিদে যে কাফের প্রবেশ করবে তার ওপর আকাশ অগ্নি বর্ষণ করবে। আর যে মুসলমান এ মসজিদের পবিত্রতা ভুলে গেছে তাদের উপরও অগ্নি বর্ষণ করবে। আমি এর আঙ্গিনা ও বারান্দা জমজম পানি দিয়ে ধুয়ে দিয়েছি। আমি মসজিদুল আকসাকে পাক-পবিত্র করে নিয়েছি।'

হাসান আবার চোখ খুললো। আবার বন্ধ করে নিল। কারণ সে এ মধুর স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হতে চাচ্ছিল না। কিন্তু চোখ বন্ধ করায় শুধু অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না এবার। বুঝলো, এবার সে বাস্তব দুনিয়ায় ফিরে এসেছে।

ছাদের উপর ও আশপাশে তখনো মুশলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির শব্দ অপূর্ব সুর মাধুরী ছড়িয়ে দিচ্ছে। যেন কুশলী শিল্পীর ঐকতানের বাদন চলছে। সেই সাথে ভেসে আসছে সমুদ্রের অর্কেস্ট্রা। গুরুগম্ভীর শব্দের তুর্যনাদ।

ঝড়বৃষ্টি ও ভূমধ্যসাগরের তোলপাড়ের শব্দ ছাপিয়ে নতুন শব্দ এলো হাসানের কানে। তার মনে হলো কেউ দরজার কড়া নাড়ছে।

দরজার আঘাতটাকে সে তার মনের কল্পনা মনে করলো। তবু সে জায়নামাজ থেকে উঠে দাঁড়ালো। প্রথমে খাটের নিচ থেকে ক্রুশ, মুর্তি ও ছবি উঠিয়ে সব কিছু স্ব-স্ব স্থানে রাখলো। দরজার করাঘাত আরো জোরালো হলো। হাসান জায়নামাজ

গুটিয়ে বালিশের নিচে রেখে দরজা খুললো।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সারা। তার মুখে একটু আগে স্বপ্নে দেখা সেই মধুর হাসি। ঝড় বৃষ্টির দরুণ সারা ভিজে চুপসে গেছে। তার কাপড় ও চুল থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছে।

'একি! সারা! তুমি এই ঝড় তুফানের মধ্যে কি জন্য এসেছো?' হাসান দরজা থেকে সরে গিয়ে তাকে ভেতরে ঢুকতে দিল।

'আমি তোমার কাছে আসিনি, অন্য একজনের কাছে গিয়েছিলাম। তাকে পেলাম না, সে গভীর ঘুমে ডুবে আছে। সারা রাত মদ পান ও অপকর্ম করে ক্লান্ত। সন্ধ্যায় জাগবে। আমি কিছুক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করে নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম। এই ঝড় তুফান কি সামনে এগুতে দেয়? তখন তোমার কথা মনে পড়লো। দিনের বেলা তোমার কাছে আসতে তো কোন বাঁধা নেই।'

হাসান একটি শুকনো কাপড় সারার হাতে তুলে দিল। সারা তা দিয়ে নিজের মাথা ও শরীর মুছে নিল। তারপর কাপড়টি দিয়ে নিজের চুলগুলো পেঁচিয়ে নিল। হাসান তাকে একটা চাদর এগিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছি, তুমি ভেজা কাপড় পাল্টে চাদরটা পরে নাও।'

সারা ভেজা কাপড় বদলাচ্ছিল আর চিন্তা করছিল, 'জ্যাকব মানুষটা সত্যি খুব ভাল। তার মধ্যে একটা সুন্দর মন আছে। মানুষকে শ্রদ্ধা করার মত উদারতা আছে। আমার এই সুন্দর দেহের প্রতি তার কোন লোভ নেই। যেখানে পুরুষরা এই

দেহকে হা করে গিলতে থাকে সেখানে সে কি সুন্দর করে বললো, 'আমি মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছি, তুমি ভেজা কাপড় পাল্টে চাদরটা পরে নাও।'

কাপড় বদলানো হয়ে গেলে সারা বললো, 'সাহেব, আর উল্টো মুখে বসে থাকার দরকার নেই। এবার সোজা হয়ে বসতে পারেন।' হাসান মুখ ফিরিয়ে বসলো। সারা দরজা খুলে তার কাপড় চিপে এনে মেলে দিল ঘরে।

'এখন বলো তুমি কোথায় গিয়েছিলে?' হাসান জিজ্ঞেস করলো, 'আমি পালিয়ে আসার পর বলো কি হয়েছিল? সে মহিলা কি ভেতরে এসেছিল?'

'সেই কারণেই তো এদিকে এসেছিলাম।' সারা বললো, 'মহিলা কামরায় প্রবেশ করেই জানতে চাইল ঘরে কে এসেছিল। আমি যতই তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে, ঘরে কেউ আসেনি, কিছুতেই সে তা বিশ্বাস করলো না। সে আমাকে কয়েকটি শর্ত দিয়ে বললো, 'যদি বাঁচতে চাও তবে আমার শর্ত মেনে নাও। তাহলে আমি আর কোনদিনও জানতে চাইবো না, তোমার ঘরে কে এসেছিল।'

আমি তাকে টাকা পয়সা দিতে চাইলাম, কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করে বললো, 'না, টাকা পয়সা কিছুই চাই না আমি, আমি চাই তুমি আমার শর্ত মেনে নাও।'

'তুমি কি বলেছো আমি তোমার কামরায় গিয়েছিলাম?'

'না, আমি তা বলিনি।'

'তার শর্তগুলো কি? তুমি কি তার শর্ত মেনে নিয়েছো?'

'শর্তগুলো এ মুহূর্তে তোমাকে বলতে চাই না। আমি শুধু এ জন্য তার শর্ত মেনে নিলাম, যাতে তুমি নিরাপদ থাকো। আমার ভয় হচ্ছিল, যদি আমি তোমার নাম বলে দেই তবে তুমি কঠিন বিপদে পড়ে যাবে। ভয়াবহ শাস্তি নেমে আসবে তোমার জীবনে।

তুমি হয়তো ভাবতে পারো, আমি কোন পবিত্র মেয়ে নই। তবু তোমাকে বলছি, আমি মুশেলের মেহমান অথবা অন্য কারো প্রমোদ কামরায় যেতে পছন্দ করি না। আমি অবশ্যই নর্তকী, কিন্তু আমি কারো খেলনা হতে চাই না। আমার নিজেরও তো কিছু পছন্দ ও অপছন্দ আছে, আমি তাই নিয়ে বাঁচতে চাই।'

'কিন্তু শর্তগুলো যে আমাকে জানতেই হবে। তুমি কি বুঝ না, শর্তগুলো না জানা পর্যন্ত আমার হৃদয় কিছুতেই শান্ত হবে না? তুমি কি আমাকে এভাবে কষ্ট দেবে?'

'শোন জ্যাকব, জীবনে আমি অনেক পাপ করেছি ঠিক, কিন্তু কখনো নষ্ট জীবনে পা দেইনি। বুড়ি আমাকে সেই নষ্ট জীবনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। সেই মহিলা আমাকে পাপের রাজ্যে হারিয়ে গেলে অঢেল সম্পদের লোভ দেখিয়েছে। বলেছে, গোপন কারবারে রাজি হলে ভাল মূল্য দেবে।

সে আমাকে মূল্যের কাঙালী মনে করেছে। আমি তাকে বলে দিয়েছি, শুধু এক রাত আমি তার ইচ্ছা পূরণ করবো। সে আজ রাতে আমাকে মুশেলের দূতের কাছে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমিও ছাড়বো না মহিলাকে, আমি সরকারকে জানাবো মহিলার

গোপন কারবারের খবর।'

'আর সেও বলে দেবে, রাতে তোমার রুমেও মানুষ যায়।' হাসান বললো।

'বলে বলুক!' সারা বললো, 'আমি তো এখন শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েই আছি। প্রয়োজনে আমি আত্মহত্যা করবো, তবে তার আগে আমি সেই মহিলার গোপন কারবারের কথা ফাঁস করে দিয়ে যাবো। আমি নর্তকী, তাই বলে বারবনিতা হতে পারবো না।'

'আমি নিজেই সেই মহিলাকে বলে দেই না কেন, আমি তোমার কামরায় কেন গিয়েছিলাম?' হাসান বললো, 'আমি বলবো, তোমার সাথে আমার দৈহিক কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের মাঝে যা আছে তা স্রেফ ভালবাসা, শুধুই আত্মার বন্ধন?'

'যদি এ কথা বলার মতো হতো এবং বললে মহিলা তা বিশ্বাস করতো তবে একথা আমিই বলে দিতে পারতাম।' সারা বললো, 'কিন্তু এ কথা সে বিশ্বাস করবে না। বরং এ কথা বলার মানে হবে ঘোড়ার পেছনে নিজেকে বেঁধে অন্যকে ঘোড়া দৌড়ানোর জন্য বলা। তোমার মত এক যুবক রাতের আঁধারে আমার কামরায় যাও আর তাতে যৌবনের তাড়না থাকে না, থাকে শুধু ভালবাসা, এ কথা কেউ মানবে না, কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'আমি কসম কেটে বলবো।'

'লাভ হবে না জ্যাকব। মানুষ ভালবাসার আবেগ বোঝে না,

তাদের কাছে সবই দৈহিক সম্পর্কের ব্যাপার। তুমি এলবার্টকে তো জানো, ইটালীর লোক। অফিসার হলেও সে সৎ ও কোমল হৃদয়ের মানুষ। সম্রাট বিলডনও তাকে বিশেষভাবে সমীহের চোখে দেখেন।

বিলডনের দরবারে এই একজনই অফিসার আছেন যিনি আমাদেরকে মানুষ মনে করেন। আর সবাই আমাদেরকে মনে করেন খেলনা পুতুল। আমি তার কাছেই যাবো এবং তার কাছে আমার সম্ভ্রম বাঁচানোর আবেদন করবো।

যদি আমার এ চেষ্টা ব্যর্থ হয় তবে আমি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবো। যদি সাগর আমার লাশ ভাসিয়ে কুলে নিয়ে আসে তবে হয়তো দেখতে পাবে আমার লাশ। নতুবা লাশও দেখতে পাবে না, শুধু ভূমধ্যসাগরের মাছ যখন খাবে তখন আমার দেহের গন্ধ পাবে।'

'সারা!' হাসান বললে, 'তুমি খৃষ্টান নও। তোমার সাথে যেসব মেয়েরা থাকে তাদের একজনও যৌবনের আমোদ ফুর্তিকে অস্বীকার করে না।

তুমি আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে যে সব কথা বলেছো তাতে আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে গেড়ে বসেছে যে, তোমার শিরায় মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত। কোন দুর্বিপাকে হয়তো তুমি খৃষ্টানদের খপ্পরে পড়ে গেছো। পরে সময়ের চক্রে ঘুরতে ঘুরতে এই পাপের চোরাবালিতে এসে পড়েছো। বলো, আমি কি মিথ্যা বলছি?'

সারা তার দিকে গভীরভাবে কিছুকক্ষণ তাকিয়ে রইলো,

পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, 'শোন জ্যাকব।'

'আমি জ্যাকব নই সারা!' হাসান বললো, 'আমার নাম হাসান ইদরিস! আর দেশ সিরিয়া। এখানে আমার নাম গিলবার্ট জ্যাকব।'

'গোয়েন্দাগিরী করো?'

'অন্য কোন কারণও হতে পারে।' হাসান বললো, 'শুধু গোয়েন্দাগিরীই কারণ নয়। যেভাবে আমরা দু'জন একে অপরের মনের সাথে একাত্ম হয়ে গেছি তাতেই প্রমাণ হয়, আমরা দু'জনই মুসলমানের সন্তান।'

সে বালিশের নিচ থেকে জায়নামাজ বের করলো এবং দেয়ালের গায়ে সাঁটানো একটি ছবি সরিয়ে সেখানকার একটা পাথর নামালো। তারপর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সেখান থেকে বের করে আনলো একটি ছোট্ট কোরআন। সারাকে দেখিয়ে বললো, 'এগুলো ছাড়া আমি থাকতে পারি না। এই মুর্তি, ছবি ও ক্রুশ চিহ্ন এ সবই রাখা হয়েছে কেবল কৌশলগত কারণে।'

'আমি যদি কাউকে বলে দেই যে, তুমি খৃস্টান নও, তুমি মুসলমান তখন কি করবে?' সারা হেসে বললো, 'তুমি মোটেও গোয়েন্দা নও। গোয়েন্দা কখনো কারো কাছে এভাবে নিজেকে প্রকাশ করে না।'

'হ্যাঁ, বলে দেখতে পারো।' হাসান বললো, 'আমি তোমার চোখের সামনেই এই ঝড় ও তুফানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবো। সত্যি, গোয়েন্দারা কখনো আমার মত নিজেই নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করে না। প্রকাশ হয়ে গেলেও সে এমনো

সহজে ধরা দেয় না, যেমন তুমি পেয়েছো। কিন্তু সারা! আমার বিশ্বাস তুমি কাউকে বলবে না।'

হাসান সামনে এগিয়ে সারার চোখে চোখ রেখে ধীর অথচ আকর্ষণীয় কণ্ঠে বললো, 'আমি জানি তুমি কখনও বলবে না, আমি জ্যাকব নই, আমি হাসান। তুমি বলতে চাইলেও তোমার মুখ এ কথা প্রকাশ করতে দেবে না। কারণ তোমার শিরায় রয়েছে রাসুল প্রেমীর রক্ত। এ রক্ত কখনো তার ফোটাকে ছলনা করতে পারে না।'

হাসানের চোখ যেন সম্মোহিত করে রেখেছে সারাকে। সে অনুভব করলো, হাসানের চোখে আটকে আছে তার চোখ। হাসান তার দিকে তাকিয়েই বললো, 'তুমি নাচের জন্য জন্ম গ্রহণ করোনি, তুমি জন্ম গ্রহণ করেছো বায়তুল মুকাদ্দাসকে কাফেরদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য। আল্লাহ আমাকে স্বপ্নে এ সুসংবাদ দিয়েছেন। পারলে এখন বলো তুমি মুসলমান নও। আমি জানি তুমি তা বলতে পারবে না।'

হাসান অনুনয় ঝরা কণ্ঠে বললো, 'সারা, এবার তুমি তোমার পরিচয় বলো। আমি তোমাকে আমার গোপন পরিচয় বলে দিয়েছি, তুমিও তোমার গোপন পরিচয় আমাকে বলো। তোমার শরীরের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই, আমি তোমার পবিত্র আত্মাকে শ্রদ্ধা করি।'

সারার উপর হাসান যেন যাদু করে বসে আছে। সারার চোখে পানি এসে গেল। সে আস্তে বললো, 'হ্যাঁ হাসান, আমি মুসলমান। আমি আমার বাবার পাপের শাস্তি ভোগ করছি। আমি

সারা নই সায়েরা।'

'পাপ যারই হোক।' হাসান বললো, 'তোমার কথার ভঙ্গিতে বুঝা যায় তুমি পাপের গ্লানিতে বিদ্ধ হয়ে আছো। তুমি খৃস্টানদের ঘৃণা করো আর মুসলমানদের পছন্দ করো এ কথা কয়েকবারই বলেছো। এতেই আমি বুঝে নিয়েছি, এই খাঁচা তোমাকে অশান্ত করে রেখেছে।'

'যখন থেকে তুমি আমার আত্মাকে পবিত্র ভালবাসা কি জিনিস চিনিয়ে দিয়েছো, তখন থেকে আমার আরাম ও আনন্দ জাহান্নামের চেয়েও বেশী বেদনাদায়ক মনে হতে শুরু করেছে। আমি পাপের মধ্যেই পালিত হয়েছি। পাপের মধ্যেই যৌবনে পৌঁছেছি। পাপের আনন্দ এখন যেন বিষধর সর্প হয়ে আমাকে দংশন করে। আমি এখন আর বেঁচে থাকতে চাই না।'

'আত্মহত্যা করাও মহাপাপ।' হাসান বললো, 'আল্লাহ ক্ষমাকারী, বড় দয়াবান। এটা আল্লাহর ওয়াদা। তওবাকারীকে ক্ষমা করার অঙ্গীকার আল্লাহ নিজে করেছেন। তুমি তোমার পাপের কাফফারা আদায় করো, দেখবে তোমার সকল অস্থিরতা আত্মার শান্তিতে পরিণত হযে যাবে।'

'কি করবো আমি? কিভাবে কাফফারা আদায় করবো?' সারা অশ্রু মুছে বললো, 'নামাজ পড়বো? দুনিয়া ত্যাগী হয়ে যাবো? বলো আমি কি করবো?'

'গোয়েন্দাগিরী!' হাসান উত্তর দিল। 'শুধু একবার, প্রথম ও শেষবার। কিন্তু তুমি সে পর্যন্ত গোয়েন্দাগিরী করতে পারবে না যতক্ষণ তুমি কেন এ কাজ করছো তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সম্পর্কে নিশ্চিত ধারনা না পাবে। মানুষ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দ্বারাই মহান ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। তুমি তো জানো সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিল? সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কি উদ্দেশ্যে পাহাড় পর্বত চষে বেড়াচ্ছেন?'

'জানি, কিন্তু এসব মহান ব্যক্তিদের তুলনায় আমি তো কিছুই না। এসব জেনেই বা আমি কি করবো?'

'তুমি ঠিকই বলেছো। তাদের তুলনায় আমরা কিছুই না। কিন্তু তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য জেনে নিজেকে সেই উদ্দেশ্যের সাথে জড়িয়ে নিতে পারলে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

তুমি আমার মধ্যে এমন কিছু পেয়েছো যার দরুণ তুমি তোমার মনের কথা আমার কাছে অকপটে বলে দিয়েছো। এটা আসলে আমার নিজের কোন প্রভাব নয়, এটা আমার মহান উদ্দেশ্যের গুণ। এই গুণ আমার ঈমানকে তরতাজা করে দেয়। আমার চলার পথ তৈরী করে দেয়। আমার ব্যক্তিত্ব, আমার মহত্ব সবটাই এ গুণেরই সৃষ্টি।

তুমি একটু চিন্তা করো, তোমার রূপ যৌবন একজন আবেদ ব্যক্তির ধ্যানও ভঙ্গ করে দিতে পারে, অথচ আমার উপর তা কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। কেন পারেনি? শুধু এই কারণে যে, আমার ঈমান তা অনুমোদন করে না। আর ঈমানের এই জোশটুকু আমি পেয়েছি জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমার সুস্পষ্ট ধারনা থাকার কারণে।'

'আমি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর উদ্দেশ্য ভাল ভাবেই জানি।' সারা বললো, 'আমি এটাও জানি, খৃস্টান শাসকরা

মুসলমান আমীর ও শাসকদেরকে সাহায্য করার নাম করে তাদেরকে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। এ জন্য তাদেরকে দিচ্ছে নানা রকম বিলাসিতার সামগ্রী। আমি এও জানি, খৃস্টানরা মুসলিম বিশ্বকে খৃস্টানদের অধীনস্ত করতে চায়।

হাসান! আমি এ উদ্দেশ্য এখানে এসেই জানতে পেরেছি। যখন এ কথা জানলাম তখনই আমার মধ্যে জন্ম নিল জাতির প্রতি টান। নইলে আমিও খৃস্টানদের পাপের স্রোতে ভেসে যেতাম। এখানে আমি কেন কিভাবে এলাম জানতে চেয়েছো তুমি। যে স্রোত আমাকে এই পর্যন্ত টেনে এনেছে সেই কাহিনীও আমি তোমাকে শোনাবো।'

ওরা কথা বলছিল। কথা তো নয়, নিজেকে মেলে ধরছিল একে অন্যের কাছে। সান্না বলছিল, 'কিছুদিন ধরেই আমার মনে মসজিদুল আকসা চেপে বসেছিল। পর পর দুই রাত আমি স্বপ্নে মসজিদুল আকসায় গিয়েছি। দেখি, মসজিদটি বিরাণ পড়ে আছে। কিন্তু সত্যি কথা হলো, আজ পর্যন্ত আমি সেই মসজিদ বাস্তবে দেখিনি।

আমি মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিলাম মসজিদের দিকে। হঠাৎ একটি গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনতে পেলাম, 'এটা তোমার আল্লাহর ঘর, একে আবাদ করো।'

কোত্থেকে এ আওয়াজ আসে দেখার জন্য আমি চারদিকে তাকালাম, কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেলাম না। এরপর আমার ঘুম ভেঙে যায়। পর পর দু'রাত আমি এ স্বপ্ন দেখি। এ

স্বপ্ন আমার মনে স্থায়ীভাবে বসে গেছে। তবে কি এটাকেই আমি আমার লক্ষ্য বানাতে পারি?'

'এটা তো প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আজ ফরজ হয়ে আছে।' হাসান বললো, 'আমি এ ফরজ আদায়ের জন্যই বৈরুতে পড়ে আছি। আমি এমন এক মিশনে আছি যেখানে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর ভয় ও শঙ্কা বিরাজ করছে। আমি যেদিন ধরা পড়বো সেদিন আমার জীবনের শেষ দিন হবে। তুমি কি নিজেকে দ্বীনের জন্য এভাবে বিলিয়ে দিতে পারবে?'

'পারবো। অবশ্যই পারবো। আমি তো নিজেকে কোরবান করার জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।' সারা বললো, 'তুমি আমাকে আমার দায়িত্ব বুঝিয়ে দাও।'

'বুড়ি তোমাকে মুশেলের দূতের কাছে যেতে বলেছে, তুমি এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও এবং স্বেচ্ছায় তার কাছে চলে যাও।' হাসান বললো।

এ কথায় সারার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। সে এতটাই বিস্মিত হলো যে, মুখ দিয়ে তার কথা সরলো না। অবাক চোখে সে হাসানের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'হ্যাঁ, সারা।' হাসান বললো, 'জাতির প্রয়োজনেই তোমাকে এ কোরবানী দিতে হবে। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী গোয়েন্দাগিরীতে মেয়েদের কোথাও পাঠান না। তিনি বলেন, 'একটি নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে একটি মজবুত কেল্লা শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিতে আমি রাজি। আমি নারীর সতীত্ব রক্ষার একজন প্রহরী।'

কিন্তু সারা তুমি এখানে রয়ে গেছো। আমাদের যে দায়িত্ব পালন করতে হবে সে দায়িত্ব শুধু তোমার দ্বারাই পালন হওয়া সম্ভব। জানি, কারো আনন্দের পাত্রী হওয়া তুমি পছন্দ করো না। আমি তোমাকে দু একটি নিয়ম কানুন শিখিয়ে দেবো যাতে তোমার সতীত্ব রক্ষা পায় আবার তার কাছ থেকে তুমি গোপন তথ্যও সংগ্রহ করতে পারো।'

হাসান বললো, 'কারো সাথে গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ। তেমন অনুরোধ তোমাকে আমি করতে পারি না। কিন্তু এখানে তুমি খৃস্টান পরিচয়ে আছো এবং শরিয়ত মোতাবেক চলা তোমার পক্ষে এখন কিছুতেই সম্ভব নয়।

পাপের রাজ্যে ডুবে থাকা এক নারী হয়েও যদি তুমি দ্বীনের সামান্য খেদমত করতে পারো তবে সে খেদমত আমি নেবো না কেন? সে জন্যই তোমাকে বলছি, তুমি যাও তার কাছে। আমি আশা করি আল্লাহ তোমার মান সম্মান সতীত্ব রক্ষার করবেন।'

'ঠিক আছে, আমি রাজি। এখন আমাকে বলো আমার কি করতে হবে।' সারা বললো, 'আমি তো বেপর্দা মেয়েই। যদি আল্লাহ আমার নিকট থেকে এমন কোরবানী নিয়ে খুশী হন তবে আমি এ কোরবানী দিতে রাজি।'

'এ দুই দূতই মুশেলের শাসক ইয়াজউদ্দিনের নিকট থেকে এসেছে।' হাসান তাকে বললো, 'আমার বিশ্বাস, তারা সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে সম্রাট বিলডনের কাছ থেকে

সাহায্য নিতে এসেছে। এ সময় আমাদের সৈন্য নাসিবা নামক স্থানে ক্যাম্প ও সেনা ছাউনি করে আছে। সুলতান আইয়ুবী নিশ্চিন্তে আছেন যে, তিনি বন্ধুদের দেশে ও তাদের মাঝে ক্যাম্প করে আছেন। কিন্তু তিনি যে তার বন্ধুবেশী মুসলমান শত্রুদের মধ্যে বাস করছেন তা তো তিনি জানেন না।

এখন আমাদের জানতে হবে সম্রাট বিলডন তাদের কি ধরনের সহায়তা দিতে সম্মত হয়েছেন। তাদের মধ্যে কোন চুক্তি হয়েছে কিনা, হলে চুক্তির শর্তগুলো কি? এ বিষয়গুলো জেনে সুলতানকে সাবধান করতে হবে আমাদের। তোমাকে জানতে হবে, খৃস্টানরা যুদ্ধের কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। মুশেল ও হলবের ছোট ছোট রাজ্যগুলোর মনোভাবই বা কি? তারা কি সত্যি গোপনে খৃস্টানদের সাথে জোট বেঁধেছে?'

হাসান তাকে বিস্তারিতভাবে তার কাজ বুঝিয়ে দিল। তারপর বললো, 'তুমি মনে করো না, তুমিই একমাত্র মেয়ে যে এ কাজ করছো। মুসলমানরা নারীদেরকে এ কাজে না লাগালেও খৃস্টানরা এ কাজে মেয়েদেরই বেশী ব্যবহার করে। খৃস্টান মেয়েরা মুসলমানদের দেশে গিয়ে সেখানকার আমীর, শাসক, সেনাপতি ও সামরিক অফিসারদের পিছনে জোঁকের মত লেগে থাকে।

এমন কোন মুসলমান দেশ নেই যেখানে ইহুদী ও খৃস্টান মেয়েরা এ কাজ করছে না। বরং বলতে পারো, মুসলিম দেশগুলোর অধিকাংশ অভিজাত ঘরেই তারা ঢুকে পড়েছে।

তারা তাদের সৌন্দর্যের মোহ দিয়ে মুসলমানদের সকল গোপন পরিকল্পনার খবর জেনে নেয়।'

'আজ থেকে এখানে আমিও সেই কাজ করবো। আমি তো আত্মহত্যারই চিন্তা করছিলাম, অতএব এ কাজে মৃত্যু নেমে এলেও আমি তা পরোয়া করি না।'

'তোমার আর আত্মহত্যা করার প্রয়োজন হবে না।' হাসান বললো, 'আমি তোমাকে পবিত্র ও খুশীময় জীবনের সুসংবাদ দিচ্ছি। আমি জানি তুমি মজলুম এক মুসলিম মেয়ে। সম্ভবত: শিশুকালে কোন কাফেলা থেকে খৃস্টান দস্যুরা তোমাকে লুট করে এনেছিল। তারাই তোমাকে এ পাপ পঙ্কিল জীবনে টেনে নামিয়েছে।'

'না, তা নয় হাসান!' সারা বললো, 'আমি নিজেই আমাকে ছিনতাই করেছিলাম। আমার এ অভিশপ্ত জীবন কাহিনী আজ নয় পরে কোনদিন তোমাকে শোনাবো। আমাকে আগে এই কাজটা শেষ করতে দাও। দোয়া করো যেন আল্লাহ আমাকে সফল করেন আর আমি আমার এ কাজের মধ্য দিয়ে আমার পাপের কাফফারা আদায় করতে পারি।'

ততোক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। সারা তার কাপড় পরে হাসানের কামরা থেকে বেরিয়ে এলো। সে যখন তার বাসায় পৌঁছলো, দেখলো সেই মহিলা তার কামরার সামনে বসে আছে।

সারাকে দেখেই মহিলাটি হেসে বললো, 'রাতের জন্য প্রস্তুত থেকো। আমার লোক মুশেলের দূতের সাথে কথা

বলেছে। আজ রাতে কোন নাচগান হবে না, আমি তোমাকে তার কামরাতে রেখে আসবো।'

'ঠিক আছে খালা, আমি যখন কথা দিয়েছি তখন আমি প্রস্তুত হয়েই থাকবো।' সারাও হেসেই জবাব দিল।

মুশেলের দুই দূতের অবস্থা ঠিক ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত। তারা এখানে এসেছে ঈমান বিক্রি করতে। মুশেলের শাসক ইয়াজউদ্দিন ইসলামের সাথে গাদ্দারী করার জন্য এ দু'জনকে নির্বাচিত করে কোন ভুল করেনি। তারা যথেষ্ট কৃতিত্বের সাথেই তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এখানে তারা এসেছে খৃস্টান সম্রাট বিলডনের কাছ থেকে সাহায্য নিতে।

সম্রাট বিলডন এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজের স্বার্থে হাসিলের জন্য কতিপয় শর্ত আরোপ করে। মুসলমান শাসকদেরকে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে পারলে এর চাইতে লাভের বিষয় তার জন্য আর কিছুই হতে পারে না। এ জন্য সে গাদ্দার মুসলিম শাসকদের পাঠানো দূতদের শাহী সম্মান ও খাতির যত্নের কোন ত্রুটি করেনি।

মুসলমান দূতদের মাঝে ঈমানের কোন লেশ ছিল না। জাতির মঙ্গল ও কল্যাণের কোন চিন্তাও ছিল না। একজন মুসলমান হিসেবে নিজেদের মধ্যে যে আত্মসম্মানবোধ ও লজ্জাবোধ থাকা দরকার তারও লেশ ছিল না তাদের মধ্যে। তাই সম্রাট বিলডনের সরবরাহ করা মদ ও মেয়ে ভোগ

করতেও বিবেকে বাঁধেনি তাদের।

আমোদ ফুর্তির এ সুযোগ পেয়ে তারা বরং খুশী। আরো খুশী সম্রাটের কাছ থেকে নানা রকম উপহার ও উপঢৌকন পেয়ে।

দূত দু'জন বৈরুতের উপকূল সংলগ্ন ভূমধ্যসাগরে নৌভ্রমণে বেরিয়েছে। এ সময় নর্তকীদের সরদারের এক লোক তাদের সাথে দেখা করলো। কথাপ্রসঙ্গে সে তাদের জানালো, বৈরুতে সারা নামে একজন নর্তকী আছে যার তুল্য সুন্দরী এই বৈরুতে নেই। দূত বললো, 'তাকে কি একবার আমাদের দেখাতে পারবে?'

লোকটি মাথা চুলকে বললো, 'কিন্তু দামী উপহার না পেলে যে সে কোথাও যায় না!'

'ওটা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি তাকে আমাদের কাছে এনে দাও, আমরা তাকে খুশী করে দেবো।'

অন্যজন বললো, 'শুধু তাকে কেন, তোমাকেও খুশী করে দেবো।'

'তাহলে কোন চিন্তা করবেন না। ধরে নিন সে আপনাদের কামরায় এসে গেছে।'

তারা দু'জন খুশীতে বাগ বাগ। দালাল লোকটি তাদের সাথে বিনিময় মূল্য ধার্য করে সেখান থেকে বিদায় হয়ে গেল। যাওয়ার আগে বললো, 'কিন্তু কার কামরায় আগে পাঠাবো?'

দূত দু'জন মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো। শেষে একজন বললো, 'এই মিশনের তিনিই প্রধান। অতএব আগে তার

কামরাতেই পাঠিয়ে দিও।'

সন্ধ্যার আগে আগেই নৌভ্রমণ থেকে ফিরে এলো ওরা। রাত নেমে এলো। অন্ধকার কালো রাত। আপন কামরায় বসে সারার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুণতে লাগল দূত প্রধান।

কালো রাতের কালো অন্ধকারে কালো আবরণে নিজেকে জড়িয়ে এক সময় সারা এসে প্রবেশ করলো সেই কামরায়।

দূতের বয়স পঞ্চাশের উপরে। গত রাতে সে এত মদ পান করেছিল যে, এক সময় সে বেহুশ হয়ে যায় এবং তাকে বেহুশ অবস্থায় রেখেই ভোরে তার প্রমোদ সঙ্গিনী কামরা থেকে বের হয়ে যায়।

আজ সে কথা মনে হতেই সাবধান হয়ে যায় দূত। কিন্তু মদের নেশা তাকে টানতে থাকে। ফলে সন্ধ্যার পর থেকেই সে অল্প অল্প পান করতে থাকে।

সে এক নর্তকীর জন্য অপেক্ষা করছিল। মনে মনে কল্পনা করছিল তার রূপ মাধুরীর কথা। যার সৌন্দর্যের রসালো কাহিনী তাকে অধীর করে তুলেছিল।

দরজা খুলতেই সে দেখলো এক মেয়ে আপাদমস্তক কালো কাপড়ে শরীর ঢেকে কামরায় প্রবেশ করছে। কাপড়ের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে একটি নিটোল দেহ-কাঠামো।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দূত বিছানা থেকে নেমে এগিয়ে গেল তাকে ধরতে। মেয়েটির কালো আবরণ উন্মুক্ত হওয়ার আগেই দূত অশ্লীল ভাষায় উল্লাস প্রকাশ করে তাকে ঝাপটে

ধরলো। তখন সে তার বয়সের কথাও ভুলে গেল।

সারা তার বাহু বেষ্টন থেকে মুক্ত হয়ে কালো আবরণ খুলে দূতের দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে সে বিস্ময়ে হা হয়ে গেল এবং ভয় ও বিস্ময়ে সে কয়েক হাত পিছনে সরে গেল। তারপর সে আবারো তাকালো দূতের দিকে এবং তাকিয়েই সরতে সরতে পেছনে একেবারে দেয়ালের সাথে ঠেকে গেল।

সে দু হাত দিয়ে তার মুখ ঢেকে নিল। দূত এগিয়ে গিয়ে সারার মুখ থেকে হাত সরিয়ে তার চেহারার দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এলো, 'সায়েরা!'

সারা অপলক নয়নে তাকে দেখতে লাগলো, যেন তার ভাষা বন্ধ হয়ে গেছে। দূত বিস্মিত হয়ে ভয় কম্পিত স্বরে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'সায়েরা! তুমি কি সায়েরা?'

কয়েক সেকেন্ড লাগলো তার নিজেকে সামলে নিতে। তারপর দু'কদম পিছিয়ে মৃদু হেসে বললো, 'না। আমি বুঝি ভুল করছি। তোমার চেহারা আমার এক মেয়ের মতই লাগছে। তার নাম সায়েরা ছিল।'

'সে সায়েরাই আমি, আপনি কোন ভুল করেননি, আমিই আপনার সেই হারিয়ে যাওয়া কন্যা।' সারার মুখের বাঁধন খুলে গেল। সে ঘৃণায় দাঁত কটমট করে বললো, 'আমি আপনার সেই বেবী, যাকে আপনি কোলে নিয়ে আদর করতেন।

কিন্তু আপনি এক লোভী ও স্বার্থপর পিতা। স্বার্থের জন্য করতে পারেন না এমন কোন কাজ নেই। আমার দুর্ভাগ্য যে,

আমি এক নির্লজ্জ ও অমানুষ পিতার কন্যা।'

দূতের মাথা ঘুরে গেল। সে টলমল পায়ে দু'পা এগিয়ে পালংকের ওপর ধপ করে বসে পড়লো। এখন তার মুখে কোন ভাষা নেই। গলা শুকিয়ে গেছে। একি দেখছে সে! সায়েরা তারই মেয়ে! সন্দেহ নেই, এ মেয়ে তারই!

সায়েরা বাপের কাছ থেকে পৃথক হয়েছে আজ দু'বছর কয়েক মাস। মেয়ে এখন কোথায় আছে, কিভাবে আছে কিছুই জানতো না সে।

'বেঈমান পিতার কন্যা বারবনিতাই হয়।' সারা সামনে এগিয়ে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে ঘৃণায় দাঁত কটমট করে বলতে লাগলো; 'আজ তোর নিজের কর্মের ফল দেখ। বদমাশ আজ তুই তোর আপন কন্যার সতীত্বের গ্রাহক। তোর কন্যা তোর প্রমোদ কামরাতেই রাত কাটাতে এসেছে।'

সারা ক্ষিপ্ত বেগে দুই হাত বাড়িয়ে বললো, 'নে, আমার মূল্য বের কর। আমি আজ রাত তো এখানেই কাটাতে এসেছি।'

'ওরে মা, তুই, তুই!' পিতার ভাষা এলোমেলো হয়ে গেল। 'তুই ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলি। আমি নির্লজ্জ নইরে, তুই নির্লজ্জ!'

'যে পিতা তার যুবতী মেয়ের সামনে কন্যার বয়সী মেয়েদের নিয়ে নির্লজ্জ আচরণ করে, নিজের কন্যার মত মেয়েদের নাচিয়ে সুখ পায়, মদের নেশায় মাতাল হয়ে তাদের দিকে হাত বাড়ায়, সে বাপের বেটির কি আর লজ্জা থাকতে

পারে। সময় হলে সেও নর্তকী ও প্রমোদবালা হয়ে যায়। বাবা যদি তার বিয়ে দিয়ে দেয় তবে এ পরিবেশে বেড়ে উঠা মেয়েরা স্বামীকে ধোঁকা দিয়ে গোপনে পরকিয়ায় মেতে উঠে।

ওরে পিতা, তুই শুনে নে, আমি তোর অতীত ও বর্তমানের কথা বলছি। আমি যখন দামেশকে তোর বাড়ীতে থাকতাম, যখন আমার সামান্য বুদ্ধি হলো তখন থেকেই দেখছি, তুই পরনারী নিয়ে গোপনে আমোদ ফুর্তি করিস।

নুরুদ্দিন জঙ্গী মারা গেলে তুই আল মালেকুস সালেহের সাথে গোপনে পালিয়ে গেলি। যাওয়ার সময় আমাকে আর মাকেও সঙ্গে নিলি। হলবে এসে তুই মদ ধরলি।

তখনো আমি যৌবনে পা দেইনি, বলতে গেলে শিশুই ছিলাম। দেখতাম তোর কাছে সাদা চামড়ার খৃস্টানরা আসছে। খৃস্টানরা তোকে ধন দৌলত দান করলো, খুব সুন্দরী মেয়েও দন করলো। তখন তুই প্রকাশ্যে আমাদের সামনেই মদ গিলতে লাগলি।

বাড়ীতে মদের আসর বসে গেল। মেয়েরা নাচতে লাগলো। সাদা চামড়ার খৃস্টানরা আমাকে টানাটানি করতে লাগলো, তুই এসব দেখেও না দেখার ভান করলি।

পরে যখন আল মালেকুস সালেহ মারা গেল, তোর কাছে খৃস্টানরা আরও বেশী আসতে লাগলো। তুই আগের চেয়েও বেশী মাতাল ও নারী বিলাসী হয়ে উঠলি।

ইয়াজউদ্দিন তোকে আরও বড় পদে দায়িত্ব দিয়ে দিল। আমিও তোর প্রমোদবালা নর্তকীদের সাথে মিশতে লাগলাম।

তাদের কাছ থেকে নাচ শিখলাম। তুই যখন জানলি আমি ভাল নাচতে শিখেছি তাতে তুই খুবই খুশী হলি।

খৃস্টানরা যখন আমার নাচ দেখলো তারা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলো, চুমু খেলো। তখন তুই সেটাও খারাপ মনে করলি না শুধু এই জন্য যে, আমার পরিবর্তে তারা তোকে ইউরোপের সুন্দরী মেয়ে দান করতো। তুই তোর ঈমান বিক্রি করে দিয়েছিলি, লজ্জা শরম ধুয়ে মুছে দিয়েছিলি।

এতটুকুতেই ক্ষান্ত হলি না তুই, তুই সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলি। এ কাজে তোর অনেক দোসর জুটে গেল। তাদের নিয়েই তুই মশগুল হয়ে গেলি। এদিকে তোর একমাত্র কন্যার কি হলো, স্ত্রীর কি হলো কিছুই দেখার সময় হলো না তোর।

এ সময় এক খৃস্টান আমাকে স্বপ্নপুরী দেখালো। আমি তোর বাড়ীকে সালাম জানিয়ে তার সঙ্গে চলে এলাম।'

এটুকু বলেই সায়েরা আবার দু'হাতে মুখ ঢাকলো। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো সে। দূত স্তব্ধ হয়ে বসে শুনছিল তার কথা। মেয়ের চেহারায় পিতার প্রতি যে চরম ঘৃণা প্রকাশ পাচ্ছিল, সে মনে মনে বলছিল, সে চিত্র দেখার দুর্ভাগ্য যেন কোন বাপের না হয়। মেয়েকে এভাবে কাঁদতে দেখে তার ভেতরটাও নড়ে উঠলো। সে মুখ তুলে করুণ স্বরে বললো, 'তারপর! তারপর কি হলো সায়েরা?'

'সে কথা আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না। যেভাবে আজ রাতে আমি তোমার বিলাস কামরায় এসেছি এমনিভাবে কত

যে লোকের বিলাস কামরা আলোকিত করেছি তার তো কোন হিসাব রাখিনি। সেই খৃস্টান আমাকে ধোঁকা দিয়ে বিক্রি করে দিয়েছিল।

আমি তোমার মত অসংখ্য ধনীদের বিলাস বাসরের রাণী হয়ে অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে বৈরুত এসে পৌঁছেছি। এখানে আমাকে শাহী দরবারের নর্তকী হিসেবে রাখা হয়েছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আজ আপন পিতাই আমার সতীত্বের খরিদ্দার হয়ে এসেছে।'

দূত লজ্জা ও শরমে নিজের মাথা দু'হাতে চেপে ধরে রেখেছিল। আবেগ ও অনুশোচনায় তার সর্বশরীর কাঁপছিল তখন।

'বেঈমানীর মূল্য আর কত পরিশোধ করবে?' সারা অবজ্ঞা ভরে বললো, 'আজ তুমি ফিলিস্তিন ও মসজিদুল আকসা বিক্রি করতে এসেছো। তোমার জানা উচিত ছিল, আপন কন্যার ইজ্জত লুটার চেয়েও এটা জঘন্য কাজ। সম্রাট বিলডনের দরবারে এসেছো তুমি আপন জাতির ইজ্জত বিক্রি করতে।'

সায়েরা আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। কাঁদতে কাঁদতেই বললো, 'আজ আমার জীবনের শেষ রাত। আমি আগামী কালের সূর্যোদয়কে আমার এ পাপ মুখ আর দেখাতে চাই না। এক বাপ তার কন্যাকে একদিন পাপের যে পথ দেখিয়েছিল সেই গোনাহের বোঝা নিয়েই আমি এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবো।'

পিতা ধীরে ধীরে তার মাথা উঠালো। তার চোখের পানি

গাল বেয়ে অঝোর ধারায় বয়ে চলেছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। সে উঠলো এবং দেয়ালে লটকানো তলোয়ার নামিয়ে তলোয়ার খাপ মুক্ত করে সারার হাতে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'বেটী, এই নাও, তোমার পাপিষ্ঠ পিতাকে তুমি নিজ হাতে হত্যা করো। এতে যদি আমার গোনাহের কাফফারা কিছুটা আদায় হয় তাই বা কম কিসে।'

সারা তার হাত থেকে তলোয়ারটি নিজের হাতে নিয়ে নিল। বললো, 'আজ রাসুলুল্লাহর উম্মত এমন অবস্থায় এসে পৌছেছে, যেখানে এক পিতা তার কন্যার হাতে তলোয়ার দিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত করার কথা না বলে, সেই তলোয়ার দিয়ে নিজেকে হত্যা করার আবদার জানায়। ভাবে, এতে তার পাপের কাফফারা কিছুটা হলেও আদায় হবে। হায়রে দুর্ভাগা জাতি!'

পিতার অনুশোচনা ও বেদনার অশ্রু দেখে সারার কণ্ঠও নরম হয়ে এলো। ধীরে ধীরে কমতে লাগলো তার ঘৃণার উত্তাপ। পিতা নত মস্তকে দাঁড়িয়েছিল তার সামনে।

এক সময় থামলো সারার রাগ। শান্ত হয়ে এলো এতোক্ষণের ক্রোধের বহ্নিশিখা। পিতার দিকে ফিরে বললো, 'মরে কোন দিন পাপের কাফফারা আদায় করা যায় না। পাপের কাফফারা আদায় করার একটাই পথ এখন আপনার সামনে খোলা আছে, আর সেই পথ হচ্ছে বেঁচে থেকে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা, তওবা করে জিহাদে শরীক হয়ে যাওয়া। আপনার কি সেই হিম্মত হবে? যদি সাহস করেন তবে আমি আপনাকে সে

সুযোগ দিতে পারি।'

পিতা পরাজিত মন নিয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার চোখের ভাষায় সীমাহীন কাতরতা ও অনুনয়।

'সম্রাট বিলডনের সাথে আপনি কি চুক্তি করেছেন? সুলতান আইয়ুবীকে পরাজিত করার জন্য কোন পরিকল্পনা করেছেন কি? করে থাকলে কি সেই পরিকল্পনা আমাকে বলুন।'

সারা বললো, 'আমি সেই সংবাদ সুলতানকে পৌঁছে দেবো। এর চেয়ে ইসলামের খেদমত ও নেকী আর কিছু হতে পারে না। এতে আপনার পাপেরই ক্ষমা হবে না, বাপ-বেটি মিলে যে পাপ করেছি, আমি বিশ্বাস করি তারও ক্ষমা হয়ে যাবে। আমরা নিজেদেরকে আবার ইসলামের খাদেম মনে করতে পারবো।'

পিতা চুপ করে শুনছিল মেয়ের কথা। সারা পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, 'আমাদের দুই বাপ বেটীর নাজাতের এই একটি মাত্র পথই খোলা আছে বাপজান। আমরা বাপ বেটী এখান থেকে পালিয়ে যাবো। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে গিয়ে বলবো আমাদের পাপের কথা। তার হাত ধরে তওবা করবো। আপনি তাকে নিজের মুখে শুনিয়ে দেবেন ষড়যন্ত্রের সব খবর। আমি মনে করি এতেই আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল হবে।'

'হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।' বাবা বললো, 'কিন্তু আমরা এখান থেকে বের হবো কেমন করে?'

'সে ব্যবস্থা আমি করবো।' সারা বললো।

পিতা কন্যাকে জড়িয়ে ধরলো। বাপ বেটি মিলে কাঁদলো অনেকক্ষণ। অন্তরের আবেগ যেন গলে গলে পড়ছে।

মেয়েদের সরদার সেই মহিলা আজ এতই খুশী যে, তার খুশী যেন আর ধরে না। সে আজ এক বড় গ্রাহক পেয়েছে। আর যে মেয়েকে এতদিন বশ মানানো যায়নি আজ তাকে বশ মানানো গেছে। সে মনে ফুর্তি নিয়েই এক সময় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে গেলো। সে জানতো, সকাল হলেই সারা আসবে। তার সাথে আসবে দামী উপহার আর মূল্য।

বাপ মেয়ের কান্নাকাটিতে কেটে গেল রাত। ভোর হলো। সারা পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বুড়ির কাছে যাওয়ার পরিবর্তে ছুটে গেল হাসান ইদরিসের কাছে।

হাসান আজও সারা রাত ঘুমোতে পারেনি দুশ্চিন্তায়। ফজর পড়ে সারার জন্য অপেক্ষা করছিল। সারা তার কামরায় ঢুকলো। মুখে বিষাদ নয় আনন্দের ছটা। হাসান বললো, 'তোমার কোন ক্ষতি হয়নি তো? খবর কিছু সংগ্রহ করতে পেরেছো?'

'না, আমার কোন বিপদ হয়নি। তোমার সাথে আমার অনেক কথা আছে। এই দূত আর কেউ নয়, আমার জন্মদাতা পিতা।'

হাসানের মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো। বললো, 'বলো কি!'

'হ্যাঁ, হাসান। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! কন্যার গ্রাহক ছিল আপন পিতা।' সারার কণ্ঠে বিষন্নতা।

এরপর সে হাসানকে শোনালো তার জীবন কাহিনী। কেমন করে বাবা তাদের বাড়ীটাকে পাপের আড্ডাখানা বানিয়ে রেখেছিল। কেমন করে সেই পাপের ভক্ত অনুরাগী হয়ে এক খৃস্টানের সাথে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে। তারপর কেমন করে এখান পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে সব খুলে বললো তাকে।

এরপর সারা বললো, 'কাল রাতে আমাকে তার কামরায় দেখে মনে হয় আব্বার হুশ ফিরে এসেছে। আমি তার অনুশোচনার কান্না দেখেছি। আব্বা এখন সুলতান আইয়ুবীর কাছে যেতেও প্রস্তুত। এবার বলো এখন কি করা যায়।'

হাসান কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তার মাথা নিচের দিকে। একটু পর মুখ তুলে বললো, 'কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে পৃথিবীটা কেমন উলট পালট মনে হচ্ছে। আমি তোমাকে বলেছিলাম, 'তুমি এক পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছো, আমি আশা করি, আল্লাহ্ তোমার ইজ্জতের হেফাজত করবেন। আল্লাহ আমার আশা পূরণ করে দিয়েছেন।

এখন আমি তোমার বাবার সাথে দেখা করবো। তার সাথে আলাপ করে বুঝতে চেষ্টা করবো, সত্যি তার মধ্যে কোন পরিবর্তন এসেছে নাকি মেয়েকে এক অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখে আবেগের বশে তিনি এ কথা বলেছেন। যদি সত্যি তিনি মন পরিরর্তন করে থাকেন তবে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আমিই তাকে সব বলে দেবো।'

সেদিনই হাসান সারার বাবার সাথে দেখা করলো। লজ্জা ও

অনুতাপে লোকটি একেবারে ম্রিয়মান হয়ে আছে। লজ্জায় কথাও বলতে পারছিল না। হাসান বললো, 'আপনি সহজ হোন। পাপের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া অবশ্যই দরকার। তার চেয়েও বেশী দরকার তওবা করে সেই পাপের কাফফারা আদায় করা।'

'আমি এখন সেই কাফফারাই আদায় করতে চাই। তুমি আমাকে পথ দেখাও।'

তারপর তাদের মধ্যে অনেক গোপন আলাপ আলোচনা হলো। হাসান তাকে সেখান থেকে বের হওয়ার উপায় বাতলে দিল। বললো, 'অস্থির হওয়ার দরকার নেই। সহজ স্বাভাবিক থাকুন। চেহারার মালিন্য দূর করুন আর আমি যেভাবে বলেছি সেভাবে কাজ করে যান। ইনশাআল্লাহ্ আমরা সফল হবো।'

তার সাথে কথা শেষ করে সে সারার সাথে দেখা করলো। তাকে বললো সমস্ত পরিকল্পনা। বললো, 'তুমি প্রস্তুতি নিয়ে সময় মত নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হয়ে যেয়ো।'

সেদিনই বিকেল বেলা। বৈরুতের জনবহুল এলাকার বাইরে এক নিরাপদ স্থানে মিলিত হলো হাসান ও সায়েরা। পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তাই নিয়ে কথা বলতে লাগলো ওরা।

সায়েরার বাবা তার খাদেমদের বললো, 'বিকেলে ঘরে বসে থাকলে অলস হয়ে যাবো। একটা ঘোড়া দাও, একটু ব্যায়ামও হোক, ভ্রমণও হোক।'

খাদেম শাহী আস্তাবল থেকে একটি তাজাদম ঘোড়া এনে

দিল তাকে। সে তার সাথী দূতকে বললো, 'তুমি আরাম করো, আমি একটু ঘুরে আসি। সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসবো।'

অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করে রাস্তায় নেমে এলেন তিনি। ঘোড়া চালিয়ে চলে এলেন শহরের বাইরে। হাসানের নির্দেশ মত নিরাপদ জায়গায় এসে পেয়ে গেলেন হাসানকে। দেখলেন সেখানে তার কন্যাও হাজির।

হাসান বললো, 'সায়েরা, তুমি তোমার পিতার পেছনে ঘোড়ায় চড়ে বসো।'

সায়েরা দেরী না করে পিতার পেছনে ঘোড়ায় চেপে বসলো। ওরা আর সেখানে অপেক্ষা করলো না, সবাই নাসিবার দিকে যাত্রা শুরু করলো।

খুব সাবধানতার সাথে পথ চলছিল ওরা। ঘোড়া চালাচ্ছিল স্বাভাবিক গতিতে, যেন তাদের গতি দেখে কেউ কোন রকম সন্দেহ না করে।

অনেক দূর চলে এলো তারা। পার হয়ে এলো বৈরুতের নগর সীমানা। সূর্য ডুবে গেছে। সামনে মরুময় প্রান্তর। তারই মাঝে কোথাও কোথাও ছোটখাট বস্তি ও জনপদ। এবার তারা নির্ভয়ে তীব্র গতিতে অশ্ব ছুটিয়ে দিল।

ওদের যাত্রা পথ ছিল খুব দীর্ঘ। একদিন একরাত লাগলো ওদের গন্তব্যে পৌঁছতে।

বৈরুতের গোয়েন্দা বিভাগের উপর সম্রাট বিলডন

আক্রোশে ফেটে পড়লেন। একদিকে মুশেলের এক দূত নিখোঁজ হয়ে গেছে, সেই সাথে নিখোঁজ সম্রাটের সবচে প্রিয় শাহী নর্তকী আর গিলবার্ট জ্যাকব নামের এক রক্ষী।

সম্রাট তাদের তিনজনকে খুঁজে বের করার হুকুম জারি করেছেন। কিন্তু এই তিনজনের কারোরই কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েদের তত্ত্বাবধায়ক মহিলা সরদারের মুখ একেবারেই বন্ধ। সে কাউকে বলতে ভয় পাচ্ছে যে, সে নিখোঁজ দূতের কামরায় সারাকে পাঠিয়েছিল। খৃস্টান গোয়েন্দা বিভাগ বৈরুত চষে ফেললো ওদের খোঁজে। কিন্তু কোথাও তাদের নাম নিশানাও নেই।

বৈরুতের মাত্র একজন জানতো তারা কোথায় গেছে। সে লোকের নাম হাতেম আলী। কিন্তু হাতেম এক অখ্যাত ব্যক্তি, যার কাজ ঘোড়ার পায়ে নাল লাগানো। যারা ঘোড়ার পায়ে নাল লাগায় তারাই শুধু তাকে চিনে।

এমন কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই গরীব লোকটি, যে ঘোড়ার পায়ে নাল লাগায় সে বৈরুতে সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হতে পারে। ফলে কেউ তাকে সন্দেহের তালিকায়ও নিল না। সম্রাট বিলডনের গোয়েন্দা বাহিনী বৈরুত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাই তাদের কোন হদিস বের করতে পারলো না।

হাসান ইদরিস, সায়েরা ও সায়েরার বাবা সুলতান আইয়ুবীর কাছে পৌছে গিয়েছিল। সুলতান আইয়ুবী অভ্যাস অনুয়ায়ী

তাবুর মধ্যে পায়চারী করছিলেন। সারার বাবা সুলতানকে খুলে বললেন সম্রাট বিলডনের সাথে তাদের কি চুক্তি হয়েছে এবং সম্রাট বিলডন ও ইয়াজউদ্দিন কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সুলতান সঙ্গে সঙ্গে তার সেনাপতিদের ডাকলেন। তারপর যুদ্ধের নকশা মেলে ওদের বলতে লাগলেন, খৃস্টানদের পরিকল্পনা কি এবং এখন এর বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নিতে হবে।

এই সংবাদ সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মধ্যে কোন বিস্ময় সৃষ্টি করলো না যে, হলব ও মুশেলের শাসক ইমামউদ্দিন ও ইয়াজউদ্দিন গোপনে খৃস্টানদের সাথে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে ও জোটবদ্ধ হয়েছে। এটা তো সে যুগের প্রথা হয়ে গিয়েছিল। রাজনীতিতে প্রতারণা ও মিথ্যাচার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতো। ছোট বড় মুসলমান আমীর ও শাসকরা খৃস্টানদের সাথে গোপনে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতো। তাদের সাথে গোপন আঁতাত করে রাজনৈতিক জোট গঠন করতো।

তাদের এই প্রচেষ্টার কারণ ছিল, সুলতান আইয়ুবী সকল মুসলিম শাসকদের ঐক্যবদ্ধ করে এক জাতিতে পরিণত করতে চাচ্ছিলেন।

এতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমীররা তাদের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে বলে ভয় পাচ্ছিল। তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পৃথক সুলতান বা শাসক হয়ে থাকতেই বেশী আগ্রহী ছিল। তারা মনে করতো খৃস্টানদের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধন থাকলে তাদের উদ্দেশ্য সফল

হবে এবং সুলতান আইয়ুবী মুসলিম শক্তির যে ঐক্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে হলব ও মুশেল ছিল তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী। হলবের প্রধান ইমামউদ্দিন ও মুশেলের শাসক ইয়াজউদ্দিনের রাজ্য ছিল বিস্তৃত, তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও ছিল জোরদার। এসব কারণে তাদের সামরিক শক্তির গুরুত্ব ছিল।

খৃষ্টানরা খুব চেষ্টায় ছিল যে, মুসলমানদের এ দুটি রাজ্য যেন তাদের কব্জায় থাকে। তারা এ দুটি রাজ্য দখল না করে তাদের তাবেদার হিসাবে পেতে চেয়েছিল। তারা চেষ্টা করছিল, যেন এরা সুলতান আইয়ুবীর কব্জায় ও অধিকারে চলে না যায়।

এ দুটি রাজ্য সুলতান আইয়ুবীর কব্জায় চলে গেলে তিনি রসদপত্র আমদানী ও সৈন্য বৃদ্ধির বিরাট সুযোগ পেয়ে যাবেন। এতে তিনি এমন শক্তি সঞ্চয় করে ফেলতে পারবেন যাতে সহজেই বায়তুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিনের উপর সামরিক অভিযান চালানো যায়।

'কাবার প্রভুর কসম, আমি হলব ও মুশেলের উপর আধিপত্য করতে চাই না।' সুলতান আইয়ুবী বহুবার এ কথা বলেছেন। 'আমি কোন মুসলমান রাজ্যের মধ্য দিয়ে সৈন্য অভিযান চালাতে চাই না। আমার অভিপ্রায় শুধু এটুকুই, এই মুসলমান আমীররা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাক এবং বাগদাদের খেলাফতের অধীনস্ত হয়ে থাক। ইসলামী খেলাফতের অধীন থাকার হুকুম কোরআনই দিয়েছে। আমি

তাদের অধীনস্ত করবো না। আমি খলিফা নই। আমি তো নিজেই খলিফার অনুসারী ও তাবেদার।'

তিনি বললেন, 'কিন্তু আমার এ চাওয়াটুকু কেন পূরণ হয় না? কারণ খেলাফতের অধীনে এলে এসব আমীরদের একটা ভয় থেকেই যাবে, খেলাফত কখনোই তাদের অবৈধ আমোদ ফুর্তি ও অপকর্ম অনুমোদন করবে না। আর খৃস্টানদের উপহার, অর্থ, নারী ও মদ সরবরাহ্ বন্ধ হয়ে যাবে। যে শাসক দুনিয়ার মিথ্যা চমক, বাহাদুরী ও আমোদ ফুর্তিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, ইসলাম কখনোই তাদের এ কাজকে অনুমোদন করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এমন সাম্রাজ্যের কোন মূল্য নেই।'

১১৮৩ সালের প্রথম দিকে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নাসিবাতে সেনা ছাউনি করেছিলেন। এখান থেকেই বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা ছিল তার। কিন্তু তিনি মুসলমান শাসকদের সহযোগিতার সম্ভাবনা মোটেই দেখতে পাচ্ছিলেন না।

তিনি বুঝতে পারছিলেন, হলব ও মুশেলের শাসকরা গোপনে ষড়যন্ত্র করছে ও খৃস্টানদের সাথে আঁতাত করছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য তার কাছে ছিল না। বৈরুতে নিয়োজিত তার গোয়েন্দা হাসান ইদরিসের আগমন তার সন্দেহকেই বাস্তবে প্রমাণ করলো।

সুলতান তার ওপর এ জন্য খুশী যে, এই গোয়েন্দা একটা

বিরাট কাজ করেছে। সে ইয়াজউদ্দিনের একজন সামরিক উপদেষ্টা ও তার কন্যা, যে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে বৈরুতে খৃস্টানদের নর্তকী হয়েছিল, তাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

ইয়াজউদ্দিনের যে দূত খৃস্টানদের কাছে সাহায্য নিতে বৈরুত গিয়েছিল তার নাম এহতেশাম উদ্দিন। এক কয়েদীর অনুভূতি নিয়েই তিনি সুলতান আইয়ুবীর দরবারে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাকে সসম্মানে তার সেনাপতিদের পাশেই বসতে দিলেন।

এহতেশাম উদ্দিনকে সকল সেনাপতিই ভাল মত চিনতেন। সেনাপতিদের কেউ তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখছিল আবার কারো মুখে ছিল হাসির চিহ্ন। কারণ তারা তাকে একজন বন্দী হিসাবেই মনে করছিল।

সুলতান আইয়ুবী সেনাপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'এতক্ষণ আমি তোমাদের কাছে যে পরিকল্পনা পেশ করলাম এবার সে সম্পর্কে তোমাদের অভিমত শুনবো। তবে তার আগে তোমরা হাসান ইদরিসের রিপোর্ট শুনে নাও।'

হাসান ইদরিস সেনাপতিদের সামনে আবার তার রিপোর্ট পেশ করলো। হাসান ইদরিসের কথা শেষ হলে সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি আশা করি, আমার বন্ধু এহতেশাম উদ্দিন নিজেই সমস্ত কথা খুলে বলবেন আপনাদের সামনে। তিনি ইয়াজউদ্দিন ও ইমামউদ্দিনের দূত হিসাবে সম্রাট বিলডনের দরবারে গিয়েছিলেন। সেখানে কি চুক্তি হয়েছে এবং

ইয়াজউদ্দিন ও ইমামউদ্দিনের নিয়তটা কি তোমরা তার বক্তব্য থেকে জানতে পারবে।'

'সম্মানিত সুলতান!' এক সেনাপতি বললো, 'আমি আশা করি তার আগে আপনি আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেবেন।'

'কি বলতে চাও?'

'এক গাদ্দার ও বন্দীকে আপনি বন্ধু বলছেন এবং যে সম্মান দিচ্ছেন তার কারণ আমাদের বোধগম্য নয়। আর তার রিপোর্ট কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য তাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে।'

সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি এহতেশাম উদ্দিনের উপর কোন দোষারোপ করছি না, যদিও তিনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য খৃস্টানদের কাছে সামরিক সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। মুশেলের শাসক ইয়াজউদ্দিন তাকে এ কাজে পাঠিয়েছিল, দোষ করলে সে করেছে, এহতেশাম উদ্দিন তো তার চাকরী করে মাত্র।'

'কিন্তু সুলতান।' বললো সেই সেনাপতি, 'এহতেশাম উদ্দিন ইয়াজউদ্দিনের শাসন বিভাগের কোন সাধারণ অফিসার নন। ইনি তার সামরিক উপদেষ্টা ও সেনাপতি। তার তো ইয়াজউদ্দিনকে পরামর্শ দেয়া উচিত ছিল, যাতে তিনি খৃস্টানদের কাছ থেকে সাহায্য না নেন?'

'আমাকে আদেশ করা হয়েছিল।' এহতেশাম উদ্দিন বললেন, 'যদি আমি তার আদেশ অমান্য করতাম, তবে আমাকে সে জল্লাদের হাতে সমর্পন করে দিতো।'

অন্য এক সেনাপতি বললো, 'আপনি নিজের মৃত্যুর ভয়ে

এক গাদ্দার শাসকের এমন আদেশ পালন করেছেন, যাতে আপনার জাতি ও ধর্মের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার হয়। নিজের জীবনকে আপনি এতই মূল্যবান মনে করেন?

আমরা আমাদের বাড়ী থেকে দূরে, নিজের সন্তান-পরিজন সম্পর্কে বেখবর হয়ে কিসের জন্য এখানে পড়ে আছি? আমরা আমাদের সারাটি জীবন কিসের জন্য এই পাহাড় ও মরুভূমিতে কাটিয়ে দিলাম? কিসের জন্য এত কষ্ট করছি?

রাতে পাথরের ওপর শয়ন করি, আর আপনি হলরের মহলে শাহজাদার মত জীবন কাটান। আপনি মদ পান করে নেশায় বিভোর হন। ইহুদী ও খৃস্টান নর্তকী নিয়ে মনোরঞ্জন করেন। এমনকি মুসলমান মেয়েরাও রেহাই পায় না আপনার ছোবল থেকে।

আপনি নরম গদীতে বসেন আর মখমলের পালংকে শয়ন করেন। অথচ আপনি আমি আমরা সবাই মুসলমান। ঈমানের দাবী আদায়ের জন্য আমরা মরতে এসেছি।'

অন্য এক সেনাপতি বললো, 'আমাদের বন্ধুদের লাশগুলো আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। হয়তো সে লাশ মাটিতে মিশে গেছে। তাদের হাড়গুলো যখন তোমার সামনে পড়ে তুমি পশুর হাড় ভেবে তা মাড়িয়ে যাও। শহীদের রক্তের কোন মূল্য নেই তোমার কাছে। ভাইকে তুমি শত্রু আর শত্রুকে বন্ধু বানিয়ে রেখেছো। আমরা যদি মরতে এসে থাকি তবে তোমাদের বাঁচার কি অধিকার আছে?'

'চুপ করো।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'এহতেশাম উদ্দিন

আমার কাছে এসে তার ভুল ও গোনাহের কাফফারা আদায় করেছে। তাকে কেউ গ্রেফতার করে বন্দী হিসাবে এখানে আনেনি, তিনি স্বেচ্ছায় আমার কাছে এসেছেন। যদি তাকে তিরস্কার করার প্রয়োজন হতো তবে আমিই তাকে তিরস্কার করতাম।'

'আজিমুশ্বান সুলতান!' অন্য এক সেনাপতি বললো।

সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে শুধু সুলতান বলো। আমাকে শান শওকত থেকে দূরে থাকতে দাও। আমাকে বাদশাহ বানানোর চেষ্টা করো না। আমি সৈনিক, আমাকে সৈনিকই থাকতে দাও। এখন বলো তুমি কি বলতে চাও?'

'আমি এহতেশাম উদ্দিন ও আমার অস্ত্রধারী ভাই, যারা এখানে উপস্থিত আছেন তাদের সবাইকে বলতে চাই, সেনাপতি ও সৈনিকরা জাতির ইজ্জত ও সম্মানের রক্ষক। সরকারের আদেশ তারা পালন করবে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য।

যদি সরকার কোন ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যে সিদ্ধান্ত দেশ ও জাতির ক্ষতি বয়ে আনতে পারে, সে ব্যাপারে সরকারকে অবহিত ও সজাগ করা উচিত তাদের। যদি সৈনিকরা কোন ব্যক্তির গোলাম হয়ে যায়, তাকে খুশী করার জন্য তার ভুল আদেশও মেনে নেয়, তাতে জাতির অমঙ্গল করা হয়।

আমি বলতে চাই, জাতির সম্মানের রক্ষক আমরা। দেশের মালিক কোন বাদশাহ বা সুলতান হতে পারে না। মালিক হলো

দেশের জনগণ। এখন আমরা এমন একটা সময় অতিবাহিত করছি, যাকে বলা যায় সামরিক শক্তির যুগ। আর মুসলমানদের জন্য এটা জিহাদের যুগ।

যদি খলিফা বা সুলতান দেশ ও জাতিকে সঠিক পথে না চালায় তবে আল্লাহর সৈনিক তাকে নিজেদের এমন শত্রু মনে করবে, যেমন ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরেকদের মনে করে। যখন আল্লাহর সৈনিকরা এহতেশাম উদ্দিনের মত সুলতান ও বাদশাহ হওয়ার নেশায় পড়ে যাবে তখন দ্বীনের লাশের উপর গীর্জা ও মন্দিরের ঘন্টা বাজতে থাকবে।' থামলো সেনাপতি।

'যুগের বিবর্তনে ইসলামের অবিনাশী চেতনার বিনাশ হয় না।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'যতদিন পর্যন্ত ইসলাম জীবিত থাকবে ততদিন কাফেররা ইসলামের ঘোর শত্রু হয়েই থাকবে। আজ আমাদের সেনাপতিদের মনে যে শক্তি ও চেতনা বিরাজ করছে যতদিন তা টিকে থাকবে ততদিন ইসলামের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু যদি তাদের মনে ক্ষমতার মোহ দানা বেঁধে উঠে তবে যে কোন সময় তারা ইসলাম নিয়েই ডুববে।

কিন্তু আমার বিশ্বাস, ইসলাম জীবিত থাকবে। জীবিত থাকবে মানুষের অফুরন্ত সুখ, শান্তি ও কল্যাণের উৎস হয়ে। কারণ এ বিধান আল্লাহর দেয়া। মানুষ কখনোই নিজের কল্যাণের জন্য এর চাইতে উৎকৃষ্ট বিধান বানাতে পারবে না। এ বিধানের যারা অনুসারী হবে কোন ভয়-ভীতি আর লোভ লালসাই তাদেরকে কাবু করতে পারবে না। নিজের কল্যাণ

নয়, তারা চিন্তা করবে সমগ্র মানবতার কল্যাণ। সভ্যতার কল্যাণ। কোন সংকীর্ণতা তাদের স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু এই চেতনা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে।

আমরা এখন কি দেখছি? বাদশাহ হওয়ার জন্য ক্ষমতাধরদের মনে জন্ম হয়েছে লোভ। লোভ আর ভয় সহোদর। তাই বাঘ এখন ছাগল ভেড়া দেখেও ভয় পায়। মুসলমান কাফেরের আঙ্গুলের ইশারায় নাচে। এমনটি অব্যাহত থাকলে একদিন দেখা যাবে, আল্লাহর সৈনিকরা দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু তাদের হাতে অস্ত্র নেই। যদি তলোয়ার থাকেও তা কোন খৃস্টানের দেয়া অস্ত্র, সে অস্ত্র ব্যবহারের জন্য আবার তাকে খৃস্টানদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।'

সুলতান আইয়ুবী বলতে বলতে চুপ হয়ে গেলেন। তিনি দৃষ্টি ঘুরিয়ে চারদিকে দেখলেন। উপস্থিত সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, 'আমিও কথায় আটকে গিয়েছি হে আমার বন্ধুগণ। আমাদের এখন কাজ করতে হবে। এ অবস্থার জন্য কে দোষী আর কে নির্দোষ সে বিতর্কে আটকে গেলে আমরা শুধু কথাই বলে যাবো। কার গোনাহ কতখানি আর কে সত্য কে মিথ্যা সেই আলোচনা করে সময় অপচয় করার মত অবস্থা এটা নয়।

এতেশামুদ্দিনের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। তিনি জানেন হলব ও মুশেলের সরকারের সাথে খৃস্টানদের কি চুক্তি হয়েছে। আপনারা তার কাছ থেকে সেই তথ্য শুনুন এবং নির্ধারণ করুন এখন আমাদের করণীয় কি? শত্রুদের সাথে

কোন ময়দানে আমরা কেমন করে যুদ্ধ করবো ?'

এহতেশাম উদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন এবং উপস্থিত সবার দিকে একবার নজর বুলিয়ে বললেন, 'হে আমার বন্ধুগণ! আমি তোমাদের সবার চোখে অবজ্ঞা ও অভিশাপ দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের দৃষ্টিতে এটাই সঠিক যে, তোমরা আমাকে মৃত্যুদন্ড দিতে চাও। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে একটি শিক্ষণীয় বিষয়। এটা সত্য যে, আমি মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিনের সন্তুষ্টি বিধানে আমার ঈমান বিক্রি করেছিলাম।

তার দূত হয়ে আমি বৈরুত গিয়েছিলাম এবং খৃস্টান সম্রাটের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, মহান আল্লাহ আমার ওপর অপরিসীম দয়া ও রহমত করেছেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতাবলে আমার জ্ঞান চক্ষু খুলে দিয়ে আমার ঈমানকে রক্ষা করেছেন। যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পড়ে আমার বিবেক বুদ্ধি সত্যের পথে ফিরে এসেছে তেমন পরিস্থিতিতে পড়লে তোমরা কেউ বাঁচতে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

বন্ধুরা, তোমাদের মধ্যে অনেক সেনাপতি ও অফিসার কি গাদ্দারী করেনি? বেঈমানীর অপরাধে অনেকে কি ধরা পড়েনি? তাদের অনেকের অবস্থা এমন ছিল, যাদের উপর সুলতানের ছিল অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস। যাদের ওপর তিনি ভরসা করতেন তেমন বিশ্বাসভাজনরাই তাঁর সাথে বেঈমানী ও গাদ্দারী করেছে।

তাই আমি তোমাদের বলতে চাই, মানুষের প্রকৃতি ও

স্বভাবে এমন এক দুর্বলতা রয়েছে যা মানুষকে বিলাস ও আরামের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর যেখানে রাতদিন পাপের পথ উন্মুক্ত থাকে সেখানে একজন দরবেশ লোকও আমোদ ফুর্তিতে গা ভাসিয়ে দিয়ে পাপের কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে।

গাদ্দার নির্মূলের জন্য আগে পাপের রাস্তাগুলো বন্ধ করা দরকার। যেখানে এখন প্রতিটি শাসক ও আমীর আরো ক্ষমতাশালী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে আর অভিজাত শ্রেণীর লোক, সরকারী বড় কর্মচারী, সেনাবাহিনীর অফিসার শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে সেখানে গাদ্দার তৈরীর কার্যক্রম চলতেই থাকবে।

আমাকে যদি তোমরা এতই পাপিষ্ঠ মনে করো তবে আমার এই তলোয়ার নাও, আমার মাথাটা দেহচ্যুত করো। আমি বিশ্বাস করি, তাতে আমার পাপ কিছুটা হলেও লাঘব হবে। আর যদি তওবার সুযোগ দাও তবে ইসলামের গৌরব বৃদ্ধির জন্য, ইসলামের খেদমতের জন্য, বিশেষ করে তোমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার অঙ্গীকার করছি আমি।'

এহতেশাম উদ্দিন বললেন, 'খৃস্টানরা সম্ভবত: তোমাদের সাথে সমুখ যুদ্ধে কখনও আসবে না। তারা আমাদের নিজের অস্ত্র দিয়েই আমাদেরকে শেষ করার ব্যবস্থা নিচ্ছে। তাদের এখন সৈন্য ক্ষয় করার কোন প্রয়োজন নেই। তারা মুসলমানদেরকে মারার জন্য মুসলমানদেরকেই সাহায্য ও উস্কানী দিয়ে যাচ্ছে।

এখানে ছোট বড় রাজ্য, যেগুলো বাগদাদের খেলাফতের

অধীনে আছে বলে তোমরা জানো তাদের সকল রাজ্য ও প্রদেশের শাসকরা গোপনে খৃস্টানদের গোলাম হয়ে গেছে এবং নিজেদের স্বাধীন বলে মনে করছে।

নিজেদের কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন শুধু সেই থাকতে পারে যে শত্রুর সাথে হাত মিলায় এবং তার সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করে। এভাবেই ভাইকে শত্রু আর শত্রুকে ভাই বানিয়ে নেয় তারা।

কোন দেশে গৃহযুদ্ধ লাগলে সেখানে শুধু একটি দলই সঠিক ও দেশপ্রেমিক হয়। অন্যান্য দলগুলো শত্রুদের বন্ধু হয়। শত্রু কখনো খুশী মনে ও সরল অন্তকরণে সাহায্য দান করে না বরং তারা নিজেদের স্বার্থে ও তাদের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাহায্য দান করে।

খৃস্টানরা আমাদের দেহের বিরুদ্ধে অঙ্গকে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। তারা মুশেলকে তাদের কমান্ডো বা গুপ্ত বাহিনীর আড্ডা বানিয়ে নিয়েছে। তারা বেশ কিছুকাল ধরেই সেখান থেকে গেরিলা আক্রমণ ও কমান্ডো অভিযান চালাচ্ছে।

এমনিভাবে হলব ও অন্যান্য ছোট ছোট রাজ্যেও তারা তাদের কমান্ডো বাহিনী পাঠিয়ে সেখানে তাদের আখড়া তৈরীর চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের একমাত্র টার্গেট সুলতান আইয়ুবী ও তার আপোষহীন বাহিনী। এখন থেকে মুসলিম অঞ্চলে থেকেই তারা আপনাদের ওপর আক্রমণ চালাবে।

আমি বৈরুতে গিয়ে জানতে পারলাম, খৃস্টানরা মুশেল থেকে একটু দূরে কোন এক পাহাড়ী এলাকায় অসংখ্য অস্ত্র ও

সামান জমা করেছে। এসব অস্ত্র তারা জমা করেছে তাদের কমান্ডো বাহিনীর জন্য। পরে প্রকাশ্য যুদ্ধের সময়ও তারা এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে।

তারা প্রকাশ্য যুদ্ধও করবে মুসলিম শাসক শ্রেণীর আড়ালে থেকে। তারা তাদের বাহিনীর বড় অংশই মুসলিম বাহিনীর সাথে একাকার করে দেবে। যুদ্ধ করবে তারা কিন্তু নাম হবে গাদ্দার মুসলিম শাসকদের। তারা জনগণের মাঝে প্রচার করবে দেশের স্বাধীনতা ও অখন্ডতার জন্যই তারা আগ্রাসী আইয়ুবীর বিরুদ্ধে লড়ছে। ফলে দেশের যুব সমাজ ও জনগণ তাদের পক্ষে থাকবে বলেই তারা আশা করছে।

আমি এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি, তারা কোন পাহাড়ের আড়ালে তাদের অস্ত্রশস্ত্র জমা করেছে। তবে আমার তথ্য সঠিক। আপনাদের গোয়েন্দা বিভাগ একটু অনুসন্ধান করলেই সে ঠিকানা পেয়ে যাবে বলে আমি আশাবাদী।'

কথা শেষ করলেন এহ্‌তেশাম উদ্দিন। সুলতান আইয়ুবী তার সেনাপতিদের মতামত জানলেন। তারপর তাদের ছুটি দিয়ে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হাসান বিন আবদুল্লাহ ও কমান্ডো বাহিনীর সেনাপতি সালেম মিশরীকে নিয়ে বসলেন জরুরী কাজে।

'আমার সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমার ধারনা ছিল, খৃষ্টানরা মুশেল ও হলবে গোপনে নিজেদের আস্তানা তৈরী করে নিতে চেষ্টা চালাবে। আর এটাও আমার সন্দেহ ছিল যে, আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা তাদের

পুরো সহযোগিতা করবে।

তোমরা এহতেশাম উদ্দিনের মুখে সব শুনেছো। সম্রাট বিলডনের কমান্ডো বাহিনী মুশেলের অদূরে যুদ্ধের অস্ত্রপাতি ও রসদপত্রের ভান্ডার জমা করেছে। এ কাজ শুধু তারাই করেনি, আমরাও করেছি। এখন এই দুই অস্ত্রভান্ডারের কোন একটির ধ্বংস মানেই অপর পক্ষের বিরাট বিজয়। এদের মধ্যে যাদের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র ধ্বংস হয়ে যাবে তাদেরকে অর্ধেক পরাজয় মেনে নিতেই হবে।

আমাদের কিছু কমান্ডো সৈন্য মুশেল ও হলবের মাঝামাঝি অবস্থান নিয়ে আছে। তাদেরকে সেখানে বসিয়েছি ইয়াজউদ্দিন ও ইমামউদ্দিনের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য। এখন বৈরুত ও তাদের দু'জনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।'

'আপনার হুকুম পেলে এখনই আমি এর ব্যবস্থা নিচ্ছি।' বললো সালেম মিশরী।

'এ কাজটা একটু জটিল হবে। বৈরুতে যাওয়ার একাধিক পথ আছে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে। বিশেষ করে গোয়েন্দারা সাধারণ পথ ছেড়ে দুর্গম পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পথ চলতেই বেশী পছন্দ করবে। ফলে এ মিশনে যাদের পাঠাবে তাদের ভয়াবহ দুর্গম অঞ্চলে ঢুকে যেতে হবে। ছড়িয়ে পড়তে হবে দূর দূরান্তে।'

'সেভাবেই ব্যবস্থা নেবো আমি। কারণ আমিও জানি, গোয়েন্দারা নিজেদের নিরাপদ করার জন্য নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে দূরে

দূরান্তের দুর্গম পথেই চলাচল করে।'

'সৈন্যদের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিও, তাদের ওপর যে ফরজ অর্পিত হয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজে কঠোর গোপনীয়তা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।'

'জ্বি, তাই করবো। আর কিছু?'

'কোন কাফেলা দেখতে পেলে তাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে হবে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'অনুসন্ধানকারী দলকে অনুসন্ধানে লাগিয়ে রাখো। আর এ কাজের জন্য আলাদা কমান্ডো গ্রুপ মোতায়েন করো। যদি বাঁধা আসে তবে তাদের বীরের মত যুদ্ধ করতে বলবে। কিছুতেই তাদের আগে বাড়তে দেয়া যাবে না।

তবে এখানেও আমাদের যুদ্ধনীতি অব্যাহত থাকবে। আমরা অহেতুক মৃত্যুর হার না বাড়িয়ে যত অধিক সংখ্যক তাদের জীবিত ধরার চেষ্টা করবো। যুদ্ধের ময়দানে লাশের চেয়ে কয়েদীরা বেশী মূল্যবান।'

তিনি হাসান বিন আবদুল্লাহর দিকে ফিরে বললেন, 'হাসান, তুমি আমাকে এক কাজ করে দেখাও। খৃস্টানরা অস্ত্রশস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ও পেট্রোলের হাড়ি কোথায় জমা করেছে তা জলদি আমাকে জানাতে চেষ্টা করো।

মনে হয় তারা সেগুলো কোন পাহাড়ের গুহায় বা গুপ্ত স্থানে গোপনে সুরক্ষিত রেখেছে। যদি তুমি সে স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করতে পারো তবে সেগুলো ধ্বংস করে আমরা সহজেই অর্ধেক যুদ্ধ জয় করে নিতে পারবো।'

'সে ব্যবস্থা ইনশাআল্লাহ আমি শিগ্রই করবো।' হাসান বললো।

'এটা সব সময় খেয়াল রাখবে, শত্রুরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সাথে লুকোচুরি খেলা যুদ্ধ চালানোর পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'ক্রুসেডাররা এবার প্রকাশ্য যুদ্ধ করার পরিবর্তে গুপ্ত আক্রমণ করার প্ল্যান এঁটেছে। কমান্ডো যুদ্ধের মজা ওরাও বুঝে গেছে। তাদের এ লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের উত্তেজিত করা। তারা চাচ্ছে আমরাই যেন তাদের উপর আগে প্রকাশ্যে আক্রমণ চালাই। আমরা এমন বেকামী করবো না। আমরাও তাদের ওপর কমান্ডো আক্রমণই চালাবো।

তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে ওঁৎ পেতে থাকবে। ফলে ওঁৎ পাতার মত স্থানে আমাদের কমান্ডোদেরও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এ কাজগুলো তোমরা দু'জনে মিলে সমাধা করার চেষ্টা করবে।'

সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আর আমার প্রথম কাজ হবে সেই আমীরদের ঐক্যবদ্ধ করা ও সাথী বানানো, যারা খৃস্টানদের বন্ধু হয়ে আছে। আমি তাদের কাছে সহযোগিতার করুণা ভিক্ষা চাইবো না। আমি এখন তলোয়ারের খোঁচায় তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা আদায় করবো।

আমি এখন প্রয়োজনে তাদের রক্ত ঝরাতেও আপত্তি করবো না, কারণ ওদের গাদ্দারীর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। মুসলমানের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতাকারী মুসলমানরা

মুসলমান নামের অযোগ্য। তারা কাফেরদের বন্ধুত্ব কবুল করে মোনাফেকের খাতায় নাম লিখিয়েছে। এখন আমার এই ভয় নেই যে, ইতিহাস আমাকে কি বলবে।

যদি আমাকে ভবিষ্যত নাগরিকরা খুনী বলে ও গৃহযুদ্ধের জন্য দায়ী করে তবুও আমি আমার সংকল্প থেকে ফিরে আসবো না। আমি ভবিষ্যত নাগরিক ও ইতিহাসের কাছে জবাবদিহী করবো না, আমি জবাবদিহী করবো আল্লাহর কাছে। মানুষের মনের নিয়ত তো এক আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

দ্বীনের ব্যাপারে যদি আমার সামনে আমার ছেলেও বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তবে তাকেও আমি হত্যা করবো। আমি এখনও বলছি, যদি বায়তুল মুকাদ্দাস খৃস্টান ও ইহুদীদের হাত থেকে মুক্ত করার জেহাদ বন্ধ করে দেই তবে ইহুদী ও খৃস্টানরা আমাদের পবিত্র কাবা শরীফের উপরও আধিপত্য বিস্তারের জন্য এগিয়ে আসবে।

বর্তমান অবস্থা দেখে আমি বলতে পারি, আমাদের আমীর ও শাসকরা এবং তাদের সন্তানরা ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকবে। তাই এখন তলোয়ার ছাড়া আমার কাছে এর কোন চিকিৎসা নেই।'

'আমরা আপনার আদেশের প্রতি চেয়ে আছি।' সালেম মিশরী বললো, 'যদি আপনি আমার মত জানতে চান তবে আমি এ কথাই বলবো, কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন, স্বাধীনতা লাভে ইচ্ছুক গাদ্দারদের চরম শাস্তি হওয়া দরকার।'

'আর আমি তাদের শাস্তি অবশ্যই দেবো।' সুলতান

আইয়ুবী বললেন।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সালেম মিশরী ও হাসান বিন আবদুল্লাহকে যুদ্ধের নির্দেশনা দিয়ে উভয়কে বিদায় করলেন।

তারা দু'জন যখন চলে গেল তখন সুলতান আইয়ুবী অন্য একটা সমস্যার বিষয়ে খুব চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি যখন বৈরুতের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে নাসিবাতে এসে ক্যাম্প করেন, ঠিক তার কিছু আগে তিনি সংবাদ পান লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূলে আসিনিয়া, কেনিয়া ও সুদানে খৃস্টান বাহিনী বিভিন্ন কাফেলার উপর লুটতরাজ শুরু করেছে।

তারা শুধু বেছে বেছে মুসলিম কাফেলাই লুট করে। মাল সম্পদ ছাড়াও উট ঘোড়া সব লুটে নিয়ে যায়। উঠিয়ে নিয়ে যায় শিশুকন্যা ও যুবতী মেয়েদের।

বেশীর ভাগ ডাকাতি সে সময় হতো যখন মিশরের হাজীদের কাফেলা যাতায়াত করতো। এই ডাকাতরা ঠিক সামরিক কায়দায় ডাকাতি করতো। কিন্তু সুলতান আইয়ুবীর কাছে তখন ততবেশী সৈন্য ছিল না, তাই এ ব্যাপারে তিনি কোন পদক্ষেপ নিতে পারেননি।

তাছাড়া তার মাথায় তখন ফিলিস্তিন ও গাদ্দার মুসলমান শাসকদের বিষয়টি চেপে বসেছিল। তিনি টের পাচ্ছিলেন গোপনে এইসব মুসলমান শাসকরা খৃস্টানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে এবং তাদের কাছ থেকে গোপনে সাহায্য সহযোগিতাও

গ্রহণ করছে। এই সব কারণে সুলতান আইয়ুবী সেদিকে তখন মনেযোগ গিতে পারেননি।

বৈরুতের অবরোধের সময় সুলতান আইয়ুবী সামুদ্রিক নৌবহর ব্যবহার করেছিলেন। সেই নৌবহরের এ্যাডমিরাল ছিলেন হিশামুদ্দিন লুলু। অবরোধ শুরুতেই বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে যায়। তখন সুলতান আইয়ুবী হিশামুদ্দিনকে সংবাদ দেন, তিনি যেন নৌবহর আলেকজান্দ্রিয়া নিয়ে যান।

তার কিছুদিন পরই সুলতান আইয়ুবী কায়রো থেকে সংবাদ পেলেন, খৃস্টানদের লুটতরাজ একটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে, কোন মুসলিম কাফেলাই ঠিকানা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

সুলতান আইয়ুবী কায়রোতে উত্তর পাঠানোর পরিবর্তে আলেকজান্দ্রিয়ায় এ্যাডমিরাল হিশামুদ্দিনকে আদেশ পাঠালেন, 'তুমি তোমার নৌবহর সেদিকে নিয়ে যাও যেখানে লোহিত সাগর তীরে ডাকাতদের উপদ্রুপ বেড়েছে। তুমি তাদের এমনভাবে প্রতিরোধ করো যাতে যাত্রীরা নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারে।'

সুলতান আইয়ুবী আরো জানালেন, 'লোহিত সাগরে তোমার সাথে কেউ নৌযুদ্ধ করতে নামবে না। বরং তুমি সাগর তীরবর্তী দেশের মাটিতে নেমে ওৎ পেতে থাকো যেন সেই সব ডাকাতদের ধরতে পারো। যারা মুসলমান যাত্রীদের কাফেলায় লুটতরাজ করে তুমি তাদের প্রতিরোধ করো।

আমি জানতে পেরেছি, ডাকাতরা সবাই খৃস্টান সেনাবাহিনীর

সদস্য। তারা পরিকল্পনা করে মুসলিম কাফেলায় লুটতরাজ করছে। এরা মরুভূমিতে থাকে না। সমুদ্রের কিনারায় থাকে।

তুমি নৌসেনাদের কয়েকটি দলে ভাগ করে নাও এবং সমুদ্রে ঘোরাফেরা করতে থাকো। যেখানে তোমার সন্দেহ হবে ডাকাতদের আড্ডা আছে সেখানে সৈন্যদের এক বা একাধিক দলকে স্থলভাগে নামিয়ে দেবে। তাদের কাজ হবে ডাকাতদের খুঁজে বের করা ও তাদের নির্মূল করা। আমার পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি লোহিত সাগরের তীরে এই অভিযান অব্যাহত রাখবে।'

হিশামুদ্দিন আদেশ পাওয়ার সাথে সাথেই লোহিত সাগর অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

যে যুগে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের সাথে যোগাযোগের জন্য সুয়েজ খাল ছিল না। লোহিত সাগরে সুলতান আইয়ুবী কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ ও বড় বড় নৌকা রেখেছিলেন। এই সাগরের পশ্চিম তীরে মিশর ও পূর্ব পাড়ে সৌদি আরব অবস্থিত। উত্তরে সিনাই মরুভূমি ও আকাবা উপসাগর।

বিভিন্ন কাফেলা যারা মিশর, সুদান ও সোমালিয়া থেকে হজ্জের জন্য যাত্রা করতো তাদের উট, ঘোড়া ও হাজীদের অন্যান্য মালামাল নৌকায় করে সুয়েজ উপসাগর পার করতে হতো। আবার কোন কোন কাফেলা লোহিত সাগরের পাড় ধরেও পথ চলতো, তাতে সাগরের ঠান্ডা বাতাসে পথ চলা তাদের জন্য আরামদায়ক হতো।

হিশামুদ্দিন সেখানে পৌঁছে সুলতানের নির্দেশ মত দুটো দলকে উপকূলে নামিয়ে দিলেন। তারা স্থলভাগে নেমেই ডাকাতদের সামনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কমান্ডো আক্রমণ করে তাদের কয়েকজনকে হত্যা করলো, বাকীরা পালিয়ে গেল। সন্ধান নিয়ে দেখা গেল এরা সবাই মরু ডাকাত। সুলতানের কথা মত কোন খৃস্টান সৈন্য তিনি সেখানে খুঁজে পেলেন না।

হিশামুদ্দিন একদিন সংবাদ পেলেন, মিশর থেকে এক বিরাট হজ্জের কাফেলা হেজাযের পথে যাত্রা করেছে। কাফেলাটি আরব মরুভূমির মধ্য দিয়ে পথ চলছিল।

হিশামুদ্দিন তাঁর কয়েকজন সৈন্যকে যাযাবরের বেশে সেদিকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা মরুভূমির অনেক পথ চষে বেড়িয়েও কাফেলার কোন সন্ধান পেলো না।

কাফেলার যাত্রীদের দুর্ভাগ্য যে, তারা সাগর তীর থেকে অনেক ভেতর দিয়ে পথ চলছিল। অত ভিতরে তাদের খুঁজতে যায়নি দলটি।

এক রাতে কাফেলা এক স্থানে ক্যাম্প করে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল। কাফেলায় হজ্জযাত্রীও ছিল, ব্যবসায়ীও ছিল। কয়েকটি পরিবারও তাদের সহযাত্রী হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল শিশু ও বৃদ্ধ। কয়েকটি কিশোরী এবং যুবতী মেয়েও ছিল কাফেলায়। উট ঘোড়ার সংখ্যাও ছিল অনেক। লোক সংখ্যা ছিল কমবেশী ছয়শোর মত।

কয়েকজনকে পাহারায় রেখে ওরা খেয়ে দেয়ে সবাই শুয়ে

পড়লো। কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই রাত পার হয়ে গেল। সকাল বেলা অন্ধকার থাকতেই জেগে উঠলো লোকজন। একজন আজান দিল, সবাই তায়াম্মুম করে জামাতের সাথে ফজরের নামাজ পড়লো।

যখন তারা যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন কোথা থেকে যেন ভেসে এলো কঠিন আওয়াজ, 'সামানপত্র বেঁধো না, তোমরা সবাই একদিকে সরে দাঁড়াও। কেউ মোকাবেলা করতে চাইলে মৃত্যু অবধারিত।'

কাফেলার কেউ কেউ চিৎকার করে উঠলো, 'ডাকাত! ডাকাত!'

ততোক্ষণে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। পূব আকাশে উঁকি দিয়েছে সূর্য। সেই আলোয় কাফেলার লোকজন স্পষ্ট দেখতে পেলো, তাদের চারপাশে মরু পোষাকে সজ্জিত কয়েক শত লোক দাঁড়িয়ে আছে।

এতোক্ষণ তারা মরুভূমির সাথে মিশে বালিতে শুয়ে ছিল, কঠিন কণ্ঠস্বরটি শোনার সাথে সাথে তারা উঠে দাঁড়িয়েছে। তাদের কেউ কেউ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহী। তাদের হাতে বর্শা ও নাঙ্গা তলোয়ার। তাদের মাথা ও মুখ সাদা রুমাল দিয়ে ঢাকা।

কাফেলার লোক সংখ্যা বেশী থাকায় তাদের ক্যাম্প ছড়ানো ছিটানো ও বিস্তৃত ছিল। ডাকাতরা তাদের ঘেরাও সংকীর্ণ করে আনতে লাগলো।

কাফেলার লোকেরা সবাই মুসলমান ছিল। নিরবে অস্ত্র সমর্পণ করা মুসলমানের স্বভাব নয়। তারা জানতো,

মরুভূমিতে পথ চলতে গেলে কাফেলার উপর আক্রমণের সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে। সে জন্য তারাও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল ও লড়াই করার জন্য প্রস্তুত ছিল।

'নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের মাঝখানে বসিয়ে দাও।' কাফেলার একজন অনুচ্চ কণ্ঠে বললো।

এ আদেশ নিরবে সবার কানে কানে পৌছে গেল।

নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা কাফেলার মাঝখানে যেতে লাগলো। ডাকাতরাও সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। কাফেলার লোকজনও হাতে বর্শা এবং তলোয়ার তুলে নিল। ডাকাতদের মোকাবেলা করার জন্য দাঁড়িয়ে গেল কাফেলার সামর্থবান সবাই।

ডাকাতের দল কাফেলায় আক্রমণ করে বসলো। শুরু হলো তলোয়ারের ঝনঝনানি ও আহতদের আর্ত চিৎকার।

অসহায় শিশু ও মেয়েরা কান্না জুড়ে দিল। প্রলয়ের বিভীষিকায় ছেয়ে গেল কাফেলা। আহত নিহত হতে লাগলো উভয় পক্ষেই। সবার কান্নার স্বর একাকার হয়ে গেল।

ডাকাতের দল বেশীর ভাগই অশ্বারোহী। এ জন্য তাদের দিকেই পাল্লা ভারী হয়ে গেল। বিশেষ করে তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পরীক্ষিত সৈনিক।

কাফেলার লোকেরাও প্রাণপণ লড়াই করছে। তারা ঐকবদ্ধভাবে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে লড়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝেই একটা সতর্কবানী শোনা যাচ্ছিল, 'মেয়েদেরকে মাঝখানে রাখো। মেয়েরা যেন পৃথক হয়ে না যায়।'

এক মেয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'আমাদের জন্য চিন্তা করবে না। আমরা তোমাদের সাথেই আছি, শত্রুদের মোকাবেলা করো।'

কাফেলার লোকজন যদি ঘোড়ার উপর সওয়ার হওয়ার সুযোগ পেতো তবে তারা আরো ভালভাবে যুদ্ধ করতে পারতো। কিন্তু তাদের ঘোড়ায় জীন আঁটা ছিল না। তাছাড়া ঘোড়ার কাছে যাওয়ার সময় সুযোগও পাচ্ছিল না তারা। তারা খৃস্টান ডাকাতদের ঘোড়ার পায়ের তলে ক্ষত বিক্ষত হতে লাগলো।

ডাকাতদের কেউ কেউ কাফেলার লোকজনের আঘাতে অশ্বপৃষ্ঠে থেকে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ক্ষতি কাফেলার লোকদেরই বেশী হচ্ছিল। কারণ তাদের মধ্যে ছিল নারী, শিশু এবং বৃদ্ধও। সবাই যোদ্ধা ছিল না। ওরা লড়াই করছিল যে যার মত। কেউ কেউ মেয়েদের ঘিরে ওদের পাহারা দিচ্ছিল। যুদ্ধ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র।

কাফেলায় সাত আটজন যুবতী ছিল। এদের মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার এক নামকরা নর্তকীও ছিলো। তার নাম রায়াদী। সে তার পেশার প্রতি বিরক্ত হয়ে তওবার জন্য হজ্জে করতে যাচ্ছিল।

তার সাথে যে লোক ছিল সে তাকে খুব ভালবাসতো। তার সহযোগিতায়ই সে তার মালিকের নিকট থেকে পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছে। তারা এখনও বিয়ে করেনি। দু'জনেরই আশা ছিল তারা মক্কায় গিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে ও পরে

হজ্জ পালন করবে।

রায়াদী নর্তকী হওয়ার কারণেই তার গতি ছিল চঞ্চল ও ক্ষিপ্র। লড়াই শুরু হওয়ার পর কিছুক্ষণ সে তার সঙ্গীর সাথেই ছিল। সঙ্গী তাকে নিয়ে বিশাল কাফেলার সাথে হজ্জে যাচ্ছিল বলে সঙ্গে কোন অস্ত্র বা তলোয়ার আনেনি। যদিও তখনকার দিনে মানুষ সফরে তলোয়ারকে পোষাকের মতই অপরিহার্য মনে করতো।

তবে তার কাছে একটা ছোরা বা খঞ্জর ছিল। সে সেই খঞ্জর হাতে রায়াদীর পাশে থেকে তাকে পাহারা দিচ্ছিল। রায়াদী তার মুখ ও মাথা এমন ভাবে ঢেকে রেখেছিল যাতে তার সৌন্দর্য ডাকাতদের চোখে না পড়ে।

এ সময় লড়াই করতে করতে এক ডাকাত তাদের কাছাকাছি এসে পড়ে। তার সাথী ডাকাতটির পিছন থেকে তার পিঠে খঞ্জর দিয়ে এমন জোরে আঘাত করলো যে, খঞ্জর সমুলে তার পিঠে বিঁধে গেলো।

সে খঞ্জর টেনে বের করতে চাইলো কিন্তু পারলো না। আহত ডাকাত ঘুরে পলকে তার বুকে তলোয়ারের মাথা বিদ্ধ করে দিল। দু'জনেই মাটিতে পড়ে গেল।

এই ডাকাতের পিঠে তীর ভর্তি কোষ ছিল, আর তার কাঁধে ধনুক লটকানো ছিল। রায়াদী তার ধনুক ও তীর কোষ খুলে নিল।

রায়াদীর পাশেই কাফেলার কিছু জিনিষপত্র গাদা করে রাখা ছিল। তাতে ছিল নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী, কাপড় চোপর ও তাবু।

রায়াদী তীর ধনুক নিয়ে তাবুর স্তুপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে গেল। খৃস্টান ডাকাতরা ঘোড়া ছুটিয়ে তার সামনে দিয়ে ছুটাছুটি করছে। রায়াদী ধনুকে তীর জুড়ে নির্দিষ্ট অশ্বারোহীকে টার্গেট করে তীর ছুঁড়তে শুরু করলো। তার নিশানা খুব ভাল ছিল। প্রতিটি তীরই লক্ষ্য ভেদ করতে লাগলো।

এভাবে সে বেশ কিছু ডাকাতকে ফেলে দিতে সক্ষম হলো। সে আরও তীর ছুঁড়লো এবং আরো দু'তিনজনকে ঘায়েল করলো। দু একটি তীর বিভিন্ন ঘোড়ার গায়েও বিদ্ধ হলো। একটি ঘোড়া তীর বিদ্ধ হয়ে পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগলো।

রায়াদীকে কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। সে আবার নিশানা ঠিক করলো এবং এক আরোহীর উপর তীর চালালো। তীরটা আরোহীর গায়ে না লেগে ঘোড়ার ঘাড়ে গিয়ে বিদ্ধ হলো। ঘোড়াটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দিগ্বিদিক ছুটতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে ঘোড়াটি তাবুর গাদার স্তুপের উপর এসে পড়লো।

এই স্তুপের আড়ালেই রায়াদী লুকিয়ে ছিল। ঘোড়া জিনিষপত্রের উপর দিয়ে হুড়মুড় করে ছুটতে গিয়ে রায়াদীর গায়ের ওপর পড়লো।

আরোহী আগেই দূরে ছিটকে পড়েছিল। ঘোড়া রায়াদীর গায়ের ওপর পড়তেই গাদার মধ্য থেকে ছড়িয়ে পড়লো তার মরণ চিৎকার।

ঘোড়াটি যখন রায়াদীর গায়ের ওপর পড়ে তখন তার কাহিল অবস্থা। জঞ্জালের কারণে সে আর অগ্রসর হতে না

পেরে ওখানেই ছটফট করতে লাগলো।

তখনও কেউ মারা যায়নি, না ঘোড়া, না সায়াদী। ঘোড়ার গলায় তীর বিদ্ধ হয়েছিল। স্তুপে কয়েক পল্টি খেয়ে সে আবার উঠে দাঁড়ালো এবং একদিকে ছুটে পালালো।

স্তুপের পাশে ছিটকে পড়া আরোহী উঠে বসলো। চিৎকারের শব্দ লক্ষ্য করে তাকালো স্তুপের দিকে। সেখানে গাদার মধ্যে একটি মাথা দেখতে পেল সে। মাথাটি কোন সুন্দরী নারীর বলেই মনে হলো তার।

আরোহী লোকটি উঠে দাঁড়ালো এবং স্তুপের জঞ্জাল সরিয়ে দেখতে পেলো সেখানে আহত এক সুন্দরী নারী। পাগলা ঘোড়ার পায়ের আঘাতে সে ক্ষতবিক্ষত। তার উঠে বসার মত অবস্থাও নেই।

তখনো সায়াদী জ্ঞান হারায়নি। খৃস্টান লোকটি তাকে ধরে উঠালো। সায়াদী তখন কাৎরাচ্ছে।

এক সময় লড়াই শেষ হলো। ডাকাত দল অনেক ক্ষতি স্বীকার করার পরও তারাই জয়ী হলো। তারা কাফেলার মাল সামান একত্রিত করে কাফেলার বেঁচে যাওয়া লোকদের মাথায় তুলে দিয়ে আস্তানার দিকে রওনা দিল।

এ লড়াইয়ের দুইদিন পর। হিশামুদ্দিন নৌ বাহিনীর এক জাহাজের ক্যাবিনে বসেছিলেন। তার কেবিনের দরজায় আঘাত হলো। তিনি বললেন, 'ভেতরে এসো।'

স্থল বাহিনীর কমান্ডার দরজা খুলে ভেতরে এলো। তার

সাথে এক লোক, লোকটির চেহারা এতই ফ্যাকাশে ও দুর্বল যে, একদম মরা মানুষের মত রক্ত শূন্য।

'খৃস্টান ডাকাতরা বিরাট এক কাফেলা লুট করেছে।' বাহিনীর লিডার হিশামুদ্দিনকে বললো, 'এই ব্যক্তি ডাকাতদের বন্দীদশা থেকে পালিয়ে এসেছে। অবশিষ্ট কাহিনী তার মুখেই শুনে নিন।'

সে লোক বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলো ঘটনা। কাফেলার ওপর কেমন করে আক্রমণ হয়েছে, কিভাবে কাফেলার লোকজন তাদের মোকাবেলা করেছে, সব। বললো, 'আমরা বীরত্বের সাথেই মোকাবেলা করেছি। কিন্তু আমাদের ঘোড়ায় জ্বীন বাঁধা ছিল না। যদি আমরা ঘোড়ার ওপর সওয়ার হতে পারতাম তবে শত্রুরা সফল হতে পারতো না।'

লোকটি আরো বললো, 'কাফেলার খুব কম সংখ্যক লোকই বাঁচতে পেরেছে। যারা শেষ পর্যন্ত বেঁচে আছে তারা এখন ডাকাতদের হাতে বন্দী। আমার মনে হয় তাদেরও এতক্ষণে হত্যা করা হয়েছে।'

লোকটি বললো, 'আমিও তাদের হাতে বন্দী ছিলাম। আল্লাহর হয়তো ইচ্ছা ছিল কথাগুলো আপনার কাছে পৌঁছানো। তাই হয়তো তিনি আমাকে সেখান থেকে বের করে এনেছেন।'

'কাফেলার নারী ও শিশুদের কি অবস্থা হয়েছে?'

'লজ্জার ব্যাপার হলেও না বলে পারছি না, পাঁচজন যুবতী ও দশ বারোজন কিশোরী তাদের কাছে বন্দী আছে। তাদের সাথে

যে ব্যবহার করা হচ্ছে তা বলার মত নয়।'

সে বললো, 'কাফেলার প্রচুর পরিমাণ মূল্যবান জিনিষপত্র, নগদ অর্থ সবই তারা লুটে নিয়েছে। নব্বইটা ঘোড়া ও প্রায় দেড় শ উটও হস্তগত করেছে তারা।'

'ওরা এখন কোথায় আছে?'

'এক ভয়ংকর ও দুর্গম পাহাড়ের আড়ালে। এমন ভীতিকর ও আতংকজনক স্থান আমি এর আগে জীবনেও দেখিনি।'

লোকটি পাহাড়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললো, 'পাহাড়ের পর পাহাড়, টিলার পর টিলা। সেই পাহাড় ও টিলা পেরিয়ে যতই ভেতরে ঢোকা যাবে ততই দুর্গম হয়ে উঠবে পথ। এক সময় দেখা যাবে একেবারে সটান খাঁড়া কতগুলো টিলা আছে।'

লোকটি বললো, 'এই টিলাগুলো পাহাড়ের অনেক ভেতরে। সেই টিলার আড়ালে ডাকাতরা গুহার ভেতর নিজেদের জন্য ছোট ছোট কামরা বানিয়ে নিয়েছে। পাহাড়ী ঝর্ণার একাধিক স্রোত আছে সেখানে। ফলে পানির কোন অভাব হয় না তাদের।

চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত পাহাড় থাকায় এলাকাটা তাদের জন্য যথেষ্ট নিরাপদ। সেখানেই তারা তাদের শক্তিশালী আড্ডা বানিয়ে নিয়েছে। এলাকাটা বিরান হওয়ার পরও তাদের কারণেই সেই দুর্গম পাহাড়ের ভেতরটা আবাদ হয়ে গেছে।'

'সেই পাহাড় এখান থেকে কত দূর হবে?'

'যে স্থানের কথা বলছি সেটা সমুদ্র উপকুল থেকে প্রায় মাইল বিশেক দূরে হবে।'

'তুমি পালিয়ে এলে কিভাবে?'

লোকটি বললো, 'লড়াইয়ের সময় কিছু ডাকাত আমাদের আঘাতে মারা গেলেও শেষ পর্যন্ত আমরা টিকতে পারিনি। আমাদের অধিকাংশ সদস্য মারা গেলে আমরা হাতিয়ার ছেড়ে দিতে বাধ্য হই।

লড়াই শেষ হলে আমরা যারা জীবিত ছিলাম সবাইকে বন্দী করে তাদের সঙ্গে নিয়ে নিল। আমাদের মাল সামান আমাদের সমস্ত উট ও ঘোড়ার পিঠে তুলে দিল। কিছু কিছু দিল আমাদের মাথায়ও। সন্ধ্যা নাগাদ তাদের সাথে পথ চলে আমরা তাদের আস্তানায় এসে পৌঁছলাম।

ক্যাম্পে এসে তারা আমাদেরকে কয়েকটি গুহায় বন্দী করে দিল। লুট করে আনা মাল সামান সব গুছিয়ে রাখলো।

রাতে তারা মদ পান করে ফুর্তি করতে লাগলো। তাদের লিডার বললো, 'দেখি আজ দামী দামী অলংকার ও কি কি জিনিস এসেছে?'

কয়েকজন গিয়ে আলাদা করে রাখা লুট করা মূল্যবান সামগ্রী এনে দলনেতার সামনে পেশ করলো। তারা সন্তুষ্টচিত্তে ওইসব মাল সামান দেখতে লাগলো। দলনেতা বললো, 'আর মেয়ে মানুষ কেমন পাওয়া গেছে?'

এবার কয়েকজন গিয়ে আমাদের মেয়েদের ধরে এনে নেতার সামনে হাজির করলো। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে নিয়ে যাও। পরে এদেরকে আমি তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দেবো।'

তারা খোলা চত্বরে মদের আসর জমিয়ে উল্লাস করছিল। সেখানে অনেক মশাল জ্বেলে এলাকাটা আলোকিত করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাতে তাদের কোন ভয় ছিল না, কারণ এ আলো দেখার মত কোন লোক অন্তত কয়েক মাইলের মধ্যে নেই এ কথা তারা ভাল করেই জানে।

আমাকে যে গুহায় রাখা হয়েছিল সেখানে আমার সঙ্গী অধিকাংশই ছিল আহত। আমি তাদের বললাম, 'তোমরা কি চাও আমি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করি?'

তারা এক বাক্যে সবাই এতে সম্মতি দিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, 'যদি তুমি মঙ্গল মতে পালিয়ে যেতে পারো তবে লোহিত সাগরের তীরে গিয়ে পৌছতে চেষ্টা করবে। সেখানে সৈন্যদের টহল বাহিনীর জাহাজ ও নৌকা পাবে। তুমি সেখানে পৌছতে পারলে আমাদের উপর যে বিপদ এসেছে তা ওদের জানাতে পারবে।'

সঙ্গীদের একজন বললো, 'আমার বিশ্বাস, এ খবর সেখানে পৌছাতে পারলে আমাদের মুক্তির কোন না কোন উপায় আল্লাহ করে দেবেন। নিশ্চয়ই এ ডাকাতদের ধরার জন্য অভিযান চালাবে আমাদের বাহিনী।'

'কিন্তু আমরা এখানে আছি তারা জানলো কি করে?'

'ঠিক আপনারা এখানে আছেন আমাদের জানা ছিল না। আমরা জানতাম, সুলতান আইয়ুবী লোহিত সাগরের উপকূল নিরাপদ রাখার জন্য টহল বাহিনীর ব্যবস্থা রেখেছেন। সেই ধারনা থেকেই তারা এমন কথা বলেছে বলে আমার মনে হয়।

কিন্তু এখানে এসে আমি আপনাদের পেয়ে গেলাম।'

'তারপর? তারপর কিভাবে পালালে তুমি সেই কথা বলো।'

'ডাকাতরা সম্পদ ও মেয়ে মানুষ পেয়ে আনন্দে মাতাল হয়ে গেল। মদ পান করতে করতে নেশায় বিভোর হয়ে ঢুলতে লাগলো ওরা। জায়গাটা এমন দুর্গম যে, খুব বেশী পাহারার কথা ওরা ভাবেনি। তাছাড়া আমরা বলতে গেলে সবাই ছিলাম আহত, আমাদের পক্ষ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কাও তাদের ছিল না।

একে একে মশাল নিভতে লাগলো। আলো কমতে লাগলো। এক সময় গভীর অন্ধকারে ডুবে গেল আমাদের গুহার মুখ।

অনেক কষ্টে গুহামুখের ঢাকনা সরানো গেল। সরানো ঠিক নয়, গুহামুখের ফাঁক গলে একজন মানুষ বেরোনোর ছিদ্র তৈরী হলো। সেই ফাঁক গলে অনেক কষ্টে বেরিয়ে এলাম আমি। তারপর চুপিসারে ঢুলুঢুলু পাহারাদারদের দৃষ্টি এড়িয়ে সরে এলাম খাঁড়া টিলাগুলোর কাছে।

সেই নিরাপদ জায়গাটিতে যাওয়ার জন্য একটি মাত্র সুড়ং পথ আছে। পথটি প্রশস্ত। ঘোড়াও পার করা যায় সেই পথে। কিন্তু সেখানে পাহারা থাকায় ওই পথ মাড়ানোর সাহস পেলাম না।

টিলাগুলো অনেক উঁচু এবং খাঁড়া হলেও তাতে বুনো লতার ঝোঁপ ছিল। অন্ধকারে সেই বুনো লতা বেয়ে টিলা পেরোনোর

সুযোগ হয়েছিল বলেই আমি এখানে পালিয়ে আসতে পেরেছি।

কিন্তু টিলা পেরোনোই সেখানে একমাত্র বিপদ ছিল না। অন্ধকারে সেখান থেকে বেরোনোর কোন পথ জানা ছিল না আমার। মরুভূমিতে বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজতে গিয়ে হন্যে হয়ে গেলাম। ঘুরে ফিরে দেখা গেল বার বার একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছি।

আমি প্রাণপণে আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলাম। কোরআনের যেসব আয়াত মুখস্ত ছিল পড়তে লাগলাম। আল্লাহর রহমতে শেষ রাতের একটু আগে টিলার-গোলক ধাঁধা থেকে বেরিয়ে এলাম।

সমুদ্র কোন দিকে এ ব্যাপারেও কোন ধারণা ছিল না। আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করে অনুমানে একদিকে হাঁটতে লাগলাম। যত জোরে সম্ভব হাঁটছিলাম আমি। সকাল হওয়ার আগেই পাহাড় ছেড়ে বহু দূরে চলে এলাম।

সারাদিন আল্লাহকে স্মরণ করে পথ চলতে লাগলাম। পথে কোন বস্তি বা কাফেলার দেখা পেলাম না। পালাবার সময় পানির একটা ছোট মশক ও সামান্য কিছু খেজুর সঙ্গে আনতে পেরেছিলাম। এতেই আমি বেঁচে গেলাম।

খুব বেশী ক্লান্ত হওয়ায় আর ছুটতে পারছিলাম না। দুপুরের একটু পর এক বালির টিলার পাশে পড়ে গেলাম। টিলার ছায়ায় আমার ঘুম এসে গেল। যখন সূর্য ডুবতে বসেছে তখন আমার চোখ খুললো।

অন্ধকার আকাশে ফুটে উঠলো তারা। তারারা আমার দিক

ঠিক করে দিল। বুঝলাম আমি এতোক্ষণ ঠিক পথেই এগিয়েছি। আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে আবার হাঁটা ধরলাম।

অনেকক্ষণ চলার পর সমুদ্রের সুবাস ও স্নিগ্ধতা অনুভব করলাম। আমি যেদিক থেকে বাতাস আসছিল সেদিকেই যাচ্ছিলাম।

আমার গতি ছিল খুবই মন্থর। কিছু দূর যাওয়ার পর একটু জিরিয়ে নিতাম। আবার পথ চলতাম। এভাবে সারা রাত চলার পর প্রভাতের কাছাকাছি সাগর তীরে এসে পৌঁছলাম।

আমার শরীর একদম ভেঙ্গে পড়েছিলো। আমি সাগরের পারে এক গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে বসলাম। তারপর কখন ঘুমিয়েছি মনে নেই।

অনেক বেলায় একজন লোক আমাকে জাগালো। দেখি সূর্য অনেক উপরে উঠে গেছে। চোখ মেলে লোকটির দিকে তাকালাম। লোকটি একজন সৈনিক।

সাগর তীরে একটি বড় নৌকাও দেখতে পেলাম। সে বিশাল নৌকাটিও সৈন্য ভর্তি। আমি সৈনিকটির কাছে আমার করুণ অবস্থার কারণ তুলে ধরলাম।

আমার মর্মান্তিক কাহিনী শুনে তিনি আমাকে কিস্তিতে তুলে নিলেন। খাদ্য ও পানীয় দিয়ে বললেন, 'তৃপ্তি সহকারে আহার করো।'

তারাই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। বলেছে, 'তোমার এ কাহিনী আমাদের কমান্ডারকে শোনাতে হবে।'

'আমাদের পথ দেখানোর জন্য তোমাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।' এ্যাডমিরাল হিশামুদ্দিন বললেন, 'কিন্তু তোমার যা অবস্থা দেখছি তাতে এক্ষুণি তুমি আমাদের সাথে যেতে পারবে না। ক্লান্তি তোমাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে।'

'আমি এক্ষুণি আপনার সাথে যেতে প্রস্তুত।' লোকটি বললো, 'আমি কেমন করে এখানে আরাম করবো? আমার সাথীরা এখন ডাকাতদের হাতে বন্দী। মুসলমান মেয়েরা পড়ে আছে দস্যুর কবলে। এই যাত্রায় যদি আমার মৃত্যুও হয় তবুও আমি যেতে রাজি।'

হিশামুদ্দিন বললেন, 'কিন্তু তুমি মরে গেলে আমাদের পথ দেখাবে কে?'

'আল্লাহ যখন আমাকে এই পর্যন্ত এনেছেন তখন আপনাদের পথ দেখানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত মারবেন না। আমার উপর এখন সবচে বড় ফরজ হচ্ছে, মজলুম মেয়েদেরকে আগে জালিমদের হাত থেকে বাঁচানো। আমি এই কঠিন দায়িত্ব পালনে জীবন দিতেও প্রস্তুত।'

'ডাকাতদের সংখ্যা কত হবে?'

'পাঁচশোর কিছু বেশী হবে।' লোকটি উত্তর দিল।

হিশামুদ্দিন নৌবাহিনীর কমান্ডারকে বললেন, 'পাঁচশো সৈনিককে প্রস্তুত হতে বলো। তোমাদের সাথে এই অভিযানে আমিও যাবো।

একে সঙ্গে নেয়ার দরকার নেই। এ লোক অচেনা পথে বিরতি নিয়ে ধীরে ধীরে এসেছে বলে আসতে বহু সময় নিয়ে

ফেলেছে। আমার মনে হয় জায়গাটা আমি চিনে ফেলেছি। আমরা সন্ধ্যায় রওনা করলে মাঝ রাতের আগেই সেখানে পৌঁছে যেতে পারবো।'

কমান্ডার বললো, 'আমাদের সেনা প্রস্তুতি কেমন হবে? সবাই কি অশ্বারোহী হবে?'

'না, আমার মনে হয় আমাদের সাথে একশ অশ্বারোহী নিলেই চলবে। বাকীরা হবে পদাতিক বাহিনী।' হিশামুদ্দিন বললেন, 'আমাদেরকে ওখানে কমান্ডো আক্রমণ চালাতে হবে। সে জন্য ঠিকানা পর্যন্ত আমাদের নিরবতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করে যেতে হবে।'

'তাহলে ঘোড়া কম নেয়াই ভাল। ঘোড়া যত বেশী হবে ততই শোরগোল ও শব্দ বেশী হবে।' কমান্ডার সায় দিল।

'আমি এই লোকের কাছ থেকে এখনই ঠিকানাটা আরো বিস্তারিতভাবে জেনে নিচ্ছি, তুমি সৈনিকদের তৈরী হতে বলো।'

'কি ধরনের অস্ত্র সঙ্গে নেয়া দরকার বলে মনে করছেন আপনি?'

'তীর তলোয়ার ছাড়াও ছোট মেনজানিক সঙ্গে নিতে হবে।' হিশামুদ্দিন বললেন, 'পেট্রোল হাঁড়ি এবং সলতেওয়ালা তীরও সঙ্গে নাও।'

'না, আমি আপনাদের সঙ্গে যাবোই।' লোকটি জেদের সুরে বললো।

'ঠিক আছে, তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্রাম নাও। যাওয়ার সময়

তোমাকে আমরা ডেকে নেবো।'

কমান্ডার লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো। হিশামুদ্দিন তাকে ডেকে বললেন, 'আর সৈনিকদের বলে দিও, আমরা কোন ডাকাত দলের সাথে লড়াই করতে যাচ্ছি না। এরা সবাই খৃস্টান সেনা। একদল প্রশিক্ষিত খৃস্টান সৈন্যের সাথে লড়াই হবে আমাদের।'

নৌবাহিনীর কমান্ডার লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দুর্গম পাহাড়ে ডাকাতদের সেই আস্তানা একটা সুরক্ষিত কেল্লার চেয়ে কম ছিল না। বরং তুলনামুলকভাবে কেল্লার চেয়েও সুরক্ষিত ও দৃঢ় ছিল।

সেখানে টিলার গোলাক ধাঁধাঁ ছিল বর্ণনাতীত। রাস্তাগুলো এমন পেঁচানো যে, বাঁক ঘুরে একটু এগুলেই আবার বাঁক। টিলার পরে টিলা আর বাঁকের পরে বাঁক সহজেই মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেয়। কোন পথ কোন দিকে গেছে বুঝা যায় না। পথগুলো বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে আছে।

এই দুর্গম অঞ্চলে টিলার গোলক ধাঁধাঁর আড়ালে খৃস্টানরা গোপন কামরা খোদাই করে বানিয়ে নিয়েছে তাদের ঘাঁটি। উট ও ঘোড়া রাখার জন্যও তারা গোপন জায়গা ঠিক করে নিয়েছিল।

হিশামুদ্দিনের পদাতিক বাহিনীর সৈন্যরা অতি সাবধানে

মাঝরাতের আগেই সেখানে গিয়ে পৌঁছলো। খৃস্টানদের ধরা পড়ার ভয় মোটেই ছিল না। সে রকম ভয় থাকলে তারা আশপাশে পাহারার ব্যবস্থা রাখতো।

সেনাপতি হিশামুদ্দিন অশ্বারোহী বাহিনীকে অনেক দূরে রাখলেন, যেন ঘোড়ার ডাক শত্রুদের কানে না যায়।

পদাতিক বাহিনীর কমান্ডার কয়েকজন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে টিলার এক গলির মধ্যে ঢুকে গেল। তারা ঘুরে ফিরে অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার পর ঘোড়ার হালকা শব্দ তাদের কানে এলো। তিনি থেমে গেলেন এবং এক উঁচু টিলার ওপরে গিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

তিনি ছিলেন খুবই কুশলী গেরিলা কমান্ডার। সন্তর্পনে লক্ষ্যস্থলে পৌছার কৌশল জানা ছিল তার। তিনি টিলার উপরে গিয়ে চারদিক নিরীক্ষণ করলেন।

টিলার উপরে বেশ চওড়া জায়গা। কোন দিক থেকে ঘোড়ার শব্দ এলো বুঝতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন তিনি। ফলে সেখান থেকে নেমে এলেন।

আবার চড়লেন গিয়ে অন্য টিলার উপরে। সেখান থেকে তিনি মানুষের কন্ঠস্বর শুনতে পেলেন। শুনতে পেলেন মানুষের হুড়োহুড়ির শব্দ। কিন্তু নিচে কাউকে দেখতে পেলেন না।

সেখান থেকে নেমে তিনি এক গলিতে প্রবেশ করলেন। গলি পথে কিছু দূর এগুতেই তিনি কাছে কোথাও কারো কন্ঠস্বর শুনলেন।

তিনি সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, শব্দ শুনেই আবার থেমে

গেলেন। তিনি সৈন্যদের ইশারা করলেন। সৈন্যরা আরো সতর্ক হয়ে অস্ত্র তাক করে সন্তর্পণে তাঁর পিছনে চলতে লাগলো।

সামনেই একটা মোড়। দুই ব্যক্তি কথা বলতে বলতে মোড় ঘুরলো। তাদের কথা বলার ভঙ্গিতে বুঝা যাচ্ছে তারা দু'জনই মদে মাতাল। সৈন্যরা অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

যখন তারা সৈন্যদের কাছাকাছি হলো তখন তাদের বুকের পাশে তলোয়ার ঠেকিয়ে দুই সৈনিক বললো, 'খামোশ, কোন কথা বলবে না।'

লোক দু'টো ভড়কে গিয়ে চোখ বড় বড় করে তাকালো তাদের দিকে। কমান্ডার তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যদি একটু শব্দ করে৷ তবে মারা যাবে।'

নেশা ছুটে গেল দুই ডাকাতের। পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধা হলো না তাদের। কারণ তারা সাধারণ ডাকাত নয়, সামরিক বাহিনীর ট্রেনিং পাওয়া সৈনিক। তারা দু'জনই চুপ মেরে গেল।

কমান্ডার তাদেরকে সেখান থেকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। জায়গাটা গলিপথ থেকে সামান্যই দূরে। কমান্ডার বললেন, 'কোন চালাকি নয়, যা জানতে চাই ঠিক ঠিক জবাব দিতে হবে। কোন রকম ভুল ধরা পড়লে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করবো না। এবার বলো তোমরা কারা? এখানে কি করছো? কয়জন আছো? কোথায় তোমাদের মূল আস্তানা?'

মাতাল দু'জন প্রাণের মায়ায় সব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিল। তাদের সাথীরা কোথায় আছে, কতজন আছে, তাদের সাথে কি

কি অস্ত্র আছে সব বলে দিল।

কমান্ডার বললো, 'ঠিক আছে, তোমাদের কথা সত্য কিনা পরখ করবো, আমাদেরকে তোমাদের আস্তানায় নিয়ে চলো।'

ডাকাত দু'জন তাদেরকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেল সেখানে, যেখানে তাদের সাথীরা আনন্দ ফুর্তি করছিল। কমান্ডার নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখলেন তাদের।

তিনি বিস্মিত হলেন আস্তানার অবস্থা দেখে। এমন নির্মম ও নির্দয় মরুভূমি, যেখানে এলে জাহান্নামের দুঃসহ চিত্রের কথা মনে হয় সেই দুর্গম পাহাড়ের আড়ালে জান্নাতের মত আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়েছে খৃস্টানরা। যেখানে পিপাসায় ছটফট করে মারা যাওয়ার ভয়ে কোন মানুষ পা রাখে না, সেখানে ওরা মদের আসর সাজিয়ে বসেছে।

মাতাল ডাকাতরা এদিক ওদিক এলোমেলোভাবে বেহুশ হয়ে পড়ে আছে। কেউ কেউ দল বেঁধে বসে বসে গান গাচ্ছে। একজন গাচ্ছে আর অন্যরা তাল দিচ্ছে তার সাথে।

মাঝখানে মাঠের মধ্যে জাজিম বিছানো। সেই জাজিমের ওপর নাচছে এক মেয়ে। মশাল জ্বলছে, আর সেই মশালের আলোয় তাকে দেখাচ্ছে অপূর্ব রূপবতী। যেন কোন পরী নাচছে।

'অনেকে ভেতরে আছে।' খৃস্টান বন্দীরা কমান্ডারকে বললো, 'তারা এখন মদ খেয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে আছে।'

'বাহ, খুব মৌজে আছো তো! এ রকম আসর কি প্রতি রাতেই হয়?'

'না, বড় কোন কাফেলা লুট করা গেলে সেই আনন্দ আমরা উপভোগ করি এভাবে উল্লাস করে। এবার কাফেলাটা বেশী বড় ছিল, তাই সরদার তিন দিন উৎসব করার ঘোষণা দিয়েছেন।'

'তোমাদের সংখ্যা ছয়শো বলেছিলে, কথাটা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ, প্রায় ছয়শো।' তারা উত্তর দিল।

মদে মাতাল এক নাইট বেহুশ হয়ে পড়েছিল নর্তকীর জাজিমের ওপর। কমান্ডার দূর থেকে ময়দানের দৃশ্য যতদূর সম্ভব দেখে নিলেন। মশালের আলো মধ্য মাঠে থাকায় সবটা দেখতে পাচ্ছিলেন না তিনি। যা দেখতে পাচ্ছিলেন না, সে অভাব তিনি পুষিয়ে নিলেন খৃস্টান কয়েদী দু'জনের কাছ থেকে প্রশ্ন করে।

তিনি কয়েদী দু'জনকে সঙ্গে নিলেন এবং সেখান থেকে নেমে এলেন। একজন কয়েদী ও কয়েকজন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তিনি দেখা করলেন সেনাপতি হিশামুদ্দিনের সাথে। বাকীদের ওখানেই সন্তর্পনে অপেক্ষা করতে বললেন। তিনি সেনাপতি হিশামুদ্দিনকে সবকিছু জানিয়ে জানতে চাইলেন এখন কি করবেন।

হিশামুদ্দিন বললেন, 'চলো। আগে আমি অবস্থাটা দেখি। তারপর অভিযান চালাবো।'

কমান্ডারের সাথে হিশামুদ্দিন সেখানে গেলেন যেখানে দাঁড়িয়ে কমান্ডার ময়দানের দৃশ্য দেখেছিল। মশালের আলোয় তিনি তাকালেন মাঠের দিকে। দেখতে পেলেন ময়দান বলতে গেলে ফাঁকা। মাঠে এখানে ওখানে মাতালরা পড়ে আছে।

তিনি শুধু একজনকেই পেলেন যে তখনো জেগে আছে এবং বসে বসে মদ পান করছে।

তিনি কমান্ডারকে অভিযান শুরু করার হুকুম দিলেন। বললেন, 'খৃস্টান ডাকাতরা এখন ঘুমিয়ে আছে। তাদের হত্যা না করে বন্দী করবে। শুধুমাত্র যারা মোকাবেলা করতে আসবে তাদেরই হত্যা করবে।'

কমান্ডার এতে আপত্তি তুলে বললো, 'আপনি এদের বাঁচার যোগ্য মনে করেন? এরা শুধু লুটেরা নয়, খুনী। হত্যার বদলে হত্যা ওদের পাওনা হয়ে গেছে। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই, চরম প্রতিশোধ।

আমি ওদের লাশগুলো এখানে এমনভাবে ফেলে রেখে যেতে চাই, যাতে মরু শিয়ালগুলো অনেক দিন ধরে তৃপ্তির ভোজ দিতে পারে। যাতে তাদের লাশগুলো পচে গলে অন্য কোথাও দুর্গন্ধ ছড়াতে না পারে।'

'না, আমিও তাদের বাঁচার যোগ্য মনে করি না। কিন্তু ঘুমন্ত ও মাতালদের আমি খুন করার অনুমতিও দিতে পারি না। কেন তারা মরছে এটা না জেনেই মারা যাক, তা চাই না আমি।'

'আপনি কি এদের বাঁচিয়ে রেখে খৃস্টানদের সাথে কোন সুবিধা আদায় করতে চান? বন্দী বিনিময় করতে চান?'

'না!' হিশামুদ্দিন বললেন, 'আমি তাও চাই না। তোমার মত আমিও ওদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই। কিন্তু সেই প্রতিশোধ আমি নেবো ওদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়

করিয়ে।

ওরা মুসলমানদের সাথে যেমন ব্যবহার করে তেমন ব্যবহার করার শিক্ষা আমরা পাইনি। নইলে আমারও আবেগ বলছে, ওদের হত্যা করো। কিন্তু বিবেক তাতে সায় দিচ্ছে না।'

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুমি জানো না, আমার অন্তরে কি মর্মজ্বালা ধিকিধিকি জ্বলছে। আমি জানি মুসলমান কয়েদীদের ওপর ওরা কেমন প্রতিশোধ নেয়। তাদের রক্তের প্রতিশোধ আমিও নিতে চাই।'

'আমিও জানি খৃস্টানদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা কত ভয়ংকর।'

'না, তুমি সব জানো না। তুমি কি জানো খৃস্টান সম্রাট আরনাত মুসলিম বন্দীদের আক্রাতে নিয়ে গিয়ে কি নির্মম আচরণ করেছিল? এটা আজ থেকে সাত বছর আগের কথা, কিন্তু আমার মনে হয় গতকালের ঘটনা।

যুদ্ধ বন্দীদের হত্যা করা আন্তর্জাতিকভাবেই আইনত: নিষেধ! কিন্তু আরনাত সমস্ত মুসলিম কয়েদীদের সারাদিন না খাইয়ে তাদেরকে দিয়ে অমানুষিক কঠিন পরিশ্রম করায়। তারপর দিন শেষে সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা নেই, বিচার আচারের বালাই নেই, ওদের মগজে আছে শুধু আক্রোশ ও হিংস্রতা। এ ঘটনা আমি সারা জীবনেও ভুলতে পরবো না।'

'আজ তার প্রতিশোধ নিন।'

'হ্যাঁ, আজ আমি তার প্রতিশোধ নেবো। কিন্তু একজনের অন্যায় অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে নয় অথবা কাপুরুষের মত তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে নয়। এদের যেটুকু অপরাধ তার শাস্তি আমি কড়ায় গন্ডায় শোধ করে দেবো।'

হিশামুদ্দিনের সৈন্যরা ময়দানে প্রবেশ করলো। তাঁরা খৃষ্টানদের মশালের আলোতে নিভে যাওয়া মশালগুলো ধরিয়ে নিল।

সৈন্যরা ঘুমন্ত ডাকাতদের বন্দী করতে গেলে নেশার ঘোরে তারা সৈন্যদের গালিগালাজ করতে লাগলো। কিন্তু তাদের প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতা ছিল না।

কেউ কেউ তাদের প্রতিরোধ করতে চাইল। অভিযানে আসা সৈন্যরা তলোয়ারের আঘাতে তাদের হত্যা করে জবাব দিল প্রতিরোধের।

এই হট্টগোলে যারা ঘুমিয়ে ছিল তারাও শোরগোল করে জেগে উঠলো। ঘুমের ঘোর কাটলে বুঝতে পারলো ব্যাপার কি ঘটছে।

তাদের অধিকাংশকেই বর্শা ও তলোয়ার দেখিয়ে গ্রেফতার করা হলো। তারা হাতে অস্ত্র নেয়ার কোন সুযোগই পেলো না।

যারা ঘরের ভেতর থেকে তলোয়ার ও বর্শা হাতে বের হলো তারা সবাই মারা গেল। বাকীরা সকলেই অস্ত্র ফেলে দাঁড়িয়ে গেল।

তাদের নাইটকে পাওয়া গেল ঘোর মাতাল অবস্থায়। নর্তকীর জন্য পাতা জাজিমের ওপর পড়ে আছে তার শরীর। প্রায় উলঙ্গ। সে হৈ চৈ শুনে নেশার ঘোরে গালিগালাজ করছিল। মুসলমান সৈন্যদেরকেই সে তার নিজের সৈন্য মনে করছিল।

তার কামরা তল্লাশী করা হলো। সেখানে পাওয়া গেল তিনজন মুসলমান মেয়ে। তার পাশের কামরা থেকেও কয়েকজন মেয়েকে উদ্ধার করা হলো। এরাও সবাই মুসলমান। মেয়েদের অবস্থা খুবই করুণ। আলুথালু শিথিল শরীর।

মেয়েরা মুসলমান সৈন্যদেরকে অন্য কোন ডাকাত দল মনে করেছিল। তাই তারা আতঙ্কে ম্রিয়মান হয়ে দিশেহারার মত তাকিয়ে ছিল ওদের দিকে।

যখন তারা জানতে পারলো, এরা সবাই মুসলিম সৈন্য তখন তারা যেন পাগল হয়ে উঠলো। তারা অঝোরে কাঁদতে লাগলো। কেউ কেউ শোকে দুঃখে ডাকাতদের গালি দিতে লাগলো।

কেউ আবার মুসলমান সৈন্যদেরকেই গালি দিতে লাগলো তাদের বিলম্বে আসার কারণে। মেয়েরা তাদেরকে কাপুরুষ বলে তিরস্কার করতে লাগলো।

কেউ কেউ বলতে লাগলো, 'যদি তোমরা মুসলমান হও তবে কাফেরদের হত্যা করছো না কেন? আমরা কি তোমাদের মা-বোন নই? আমাদের মান-ইজ্জত কি তোমাদের মা-

বোনদের থেকে আলাদা?'

সে সময় হিশামুদ্দিন ও তার বাহিনীর সবাই ডাকাতদের বন্দী করা ও গুহার অভ্যন্তরে অনুসন্ধান চালানোর কাজে ব্যস্ত ছিল। তারা মেয়েদের ক্ষোভ ও রাগের কোন জবাব দিল না।

এত সহজে এমন বিশাল বাহিনী পরাস্ত করা যাবে ধারনাও করেননি কমান্ডার বা হিশামুদ্দিন। অভিযান শেষে আল্লাহর এ অভাবিত সাহায্যের জন্য শোকরিয়া জানালেন হিশামুদ্দিন। সৈনিকদের বললেন, 'এটা আল্লাহরই দয়া যে, শাহাদাতের কোন নজরানা না নিয়েই আল্লাহ আমাদের এক বিরাট বিজয় দান করলেন।'

ভোর রাতে বন্দীদের নিয়ে হিশামুদ্দিন রওনা দিলেন উপকূলের দিকে।

ভোর হলো। ততোক্ষণে খৃস্টানদের নেশা সম্পূর্ণ কেটে গেছে। রাতেই তাদের নিয়ে যাত্রা করার ফলে ভোরের দিকে তারা উপকূলে পৌঁছে গেল। সূর্য উঠলে তারা দেখলো লোহিত সাগরের তীরে বসে আছে ওরা।

উপকূলে এসে পৌঁছার পরপরই বন্দী খৃস্টানদের এক জায়গায় বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। তারা বসার পর তাদের চারপাশে দাঁড়িয়ে গেল সশস্ত্র সৈন্যরা। একটু দূরত্বে ধনুকে তীর জুড়ে নিশানা তাক করে দাঁড়িয়ে রইল তীরন্দাজ বাহিনী।

মেয়েদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো এ্যাডমিরাল হিশামুদ্দিনের

হেফাজতে। তাদেরকে সবার আগে জাহাজে তুলে দিয়ে তাদের আরামের ব্যবস্থা করা হলো।

গুণে দেখা গেল বন্দীদের সংখ্যা পাঁচশো চৌদ্দ জন। ধারনা করা হলো রাতে মোকাবেলা করতে গিয়ে প্রায় শ'খানেক ডাকাত মারা গেছে।

তারা টিলার মধ্যে যেসব জিনিষপত্র ও অর্থ জমা করেছিল সেগুলো পড়েছিল সাগর তীরে। সেই সাথে ছিল খৃস্টানদের বিশাল অস্ত্রভান্ডার। মুজাহিদরা সেগুলোও পাহারা দিচ্ছিল।

বন্দীদের লিডার সেই নাইটকে হাজির করা হলো সুলতান আইয়ুবীর নৌবাহিনী প্রধান এ্যাডমিরাল হিশামুদ্দিনের সামনে। তিনি তার কাছে জানতে চাইলেন তাদের পরিচিতি।

নাইট জানালো, তারা প্রসিদ্ধ খৃস্টান সম্রাট বিলডনের সেনাবাহিনী। মুসলমানদের কাফেলা লুট করার জন্য তিনি তাদেরকে এখানে নিয়োজিত করেছেন। এখানে তারা বিরাট ঘাঁটি বানিয়ে আরামেই ডাকাতি করে যাচ্ছিল।

'এ সম্পদ দিয়ে তোমরা কি করো?'

'এখানে যে সম্পদ লুট হয় তার কিছু অংশ সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ হয়। অবশিষ্ট সবই সম্রাটের দরবারে পাঠানো হয়। উট এবং ঘোড়াও সরকারী হিসাবে চলে যায়।'

'তোমরা মেয়েদের কি করেছো? শিশুদের কি করেছো? কাফেলায় যেসব মেয়ে এবং শিশু ছিল, যাদের তোমরা বন্দী করে এনেছিলে তাদের সবাইকে পাওয়া যায়নি। ওরা কোথায়? কি করেছো ওদের?'

'মেয়েদের সম্পর্কে আমাদের ওপর নির্দেশ আছে, যারা অসাধারণ সুন্দরী তাদেরকে আমাদের হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতে হবে। শিশুদের ব্যাপারেও একই রকম নির্দেশ, মেয়ে শিশুদের হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতে হবে।'

'কেন? এইসব শিশুদের দিয়ে তোমাদের কাজ কি?'

'তাদেরকে সেখানে গোয়েন্দাগিরী করার ট্রেনিং দেয়া হয়। যখন ওরা যৌবনে পা দেয় তখন ওদের পাঠিয়ে দেয়া হয় কোন মুসলিম দেশে। ওখানে ধ্বংসাত্মক কাজ, নাশকতা ও গোয়েন্দাগিরীতে লাগিয়ে দেয়া হয় ওদের। আর তাদের মধ্যে যারা পরমাসুন্দরী তাদেরকে হেডকোয়ার্টারেই রেখে দেয়া হয়।'

'এই কাফেলার কয়জন শিশুকে বন্দী করেছিলে তোমরা? তাদের সবাইকে কি হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিয়েছো?'

'বারো চৌদ্দজন শিশু ছিল।' খৃস্টান কমান্ডার বললো, 'তাদের মধ্যে মাত্র একজনকে কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।'

'আর অবশিষ্ট শিশুরা?'

'তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে।'

'আর কাফেলার যে সব লোক ধরে এনেছিলে তারা কোথায়?'

'তাদেরকে শুধুমাত্র মালপত্র বহনের জন্যই বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। পরে সবাইকে হত্যা করা হয়েছে।'

'কেন্দ্রে কি তবে মাত্র একজন শিশুকেই পাঠিয়েছো?'

'না, একজন মেয়েও পাঠানো হয়েছে।' নাইট বললো, 'পরমা সুন্দরী মেয়ে পেলে তাদের কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়ার

নির্দেশ ছিল। বন্দীদের মধ্যে এক যুবতী ছিল। সে ছিল এক নর্তকী। তার শারিরীক গঠন, মুখের সৌন্দর্য ও নাচের ভঙ্গিমা সবই ছিল অপূর্ব।

এ ধরনের মেয়ে আমরা অনেক অনুসন্ধান করেও পাই না। ভাগ্যক্রমেই আমরা এ মেয়েকে পেয়ে যাই।'

'ওদের কি বৈরুত পাঠিয়েছো? এত তাড়াহুড়ো করে পাঠানোর কারণ কি?'

'না, গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সরাসরি আমরা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রাখি না। এ জন্য সিরিয়ায় আমাদের একটি কেন্দ্র আছে। আমরা ওদেরকে সেখানেই পাঠিয়ে দিয়েছি। আর তাড়াতাড়ি পাঠানোর কারণ হলো, এমন মেয়েদের বেশী দিন সৈনিকদের কাছাকাছি রাখতে নেই। কখন কোন সৈন্য তাকে মুক্ত করার প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে পালাবে এ-ভয়েই তাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

হিশামুদ্দিন তার কমান্ডারের দিকে ফিরলেন। বললেন, 'এই শয়তানরা কেবল একটি হজ্জ কাফেলাই লুট করেনি। তারা কাফেলার নিরীহ লোকদের বন্দী করে পরে সেই নিরস্ত্র লোকগুলোকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এমনকি কাফেলার শিশুদেরকেও ঠান্ডা মাথায় খুন করতে ওদের বিবেক সামান্যও কাঁপেনি। এই অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তি তাদেরকে পেতে হবে।'

হিশামুদ্দিন আফসোস করে কমান্ডারকে বললেন, 'হায়, এই পবিত্র কাফেলাটি হেজায পর্যন্ত যেতে চেয়েছিল আল্লাহর

ঘর জিয়ারত করতে। কিন্তু হতভাগ্য হজ্জযাত্রীদের সেই আশা পূরণ হয়নি। তার আগেই এই খুনীরা তাদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে। এখন এই খুনীদেরকে আমি হেজায পাঠাবো। আর সেখানেই ওদের বিচার হবে।'

হিশামুদ্দিন নাইটকে নিয়ে সেই স্থানটি পরিদর্শন করতে গেলেন, যেখানে তারা হজ্জযাত্রীদের পাইকারীভাবে হত্যা করেছিল। নেকড়ে ও মরু শৃগাল তাদের লাশগুলো খেয়ে ছিন্নভিন্ন করে রেখেছিল।

হিশামুদ্দিন খৃস্টান কয়েদীদের দিয়ে ওখানে কবর খোদাই করলেন। তারপর মৃতদের জন্য জানাজা পড়ে সমস্ত লাশ দাফন করলেন।

এই লাশগুলো তার চিন্তা-চেতনাকে এতটাই আচ্ছন্ন করে দিল যে, বন্দীদের শাস্তি দেয়ার জন্য তিনি কঠিন সংকল্প গ্রহণ করলেন।

তিনি এই ঘটনার খবর দিয়ে কায়রো ও সুলতান আইয়ুবীর কাছে কাসেদ পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু কাসেদদের ফিরে আসার অপেক্ষা না করে তিনি সমস্ত কয়েদীদের জাহাজে বোঝাই করলেন। তারপর জাহাজ ছাড়লেন জেদ্দা বন্দরের উদ্দেশ্যে।

জেদ্দা পৌঁছে তিনি বন্দীদের নিয়ে গেলেন মীনা প্রান্তরে। সেখানে হজ্জ কাফেলার নিরীহ ছয় শতাধিক যাত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যা করার অপরাধে তাদের সবাইকে মৃত্যুদন্ড দিলেন এবং এই দন্ড অবিলম্বে কার্যকর করা হলো।

ইউরোপের ঐতিহাসিকরা এই মৃত্যুদন্ডকে বর্বরোচিত বলে

আখ্যায়িত করেছে কিন্তু নিরীহ হজ্জ যাত্রীদের খুন করার বিষয়ে তারা কোন মন্তব্য করেনি।

খৃস্টান ঐতিহাসিকরাও এ জন্য উত্তেজিত ভাষায় উষ্মা প্রকাশ করেছে। তারা অভিযোগ করে বলেছে, হিশামুদ্দিন বন্দীদের হত্যা করে অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু এই বন্দীরা কোন ধরনের বন্দী এবং তাদের অপরাধ কতটুকু সে ব্যাপারে তারা নিশ্চুপ।

মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ্যাডমিরাল হিশামুদ্দিন লুলুর এই শাস্তিদানের ব্যাপারে সুলতান আইয়ুবী কিছুই জানতেন না। হিশামুদ্দিন লুলু শরীয়তের কিসাসের বিধান অনুযায়ী নিজে এককভাবেই তাদের শাস্তি দানের পর্বটি সমাধা করেছিলেন।

খৃস্টান ডাকাত কমান্ডার যে নর্তকীর কথা বলেছিল, সে নর্তকীকে নিয়ে কাফেলা সিরিয়ার দিকে যাচ্ছিল। এই নর্তকীর নাম রায়াদী।

ঘোড়ার নিচে চাপা পড়ায় তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়েছিল। কমান্ডার এই ভয়ে তাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিল, যেন তার উপর কোন দোষারোপ না আসে যে, সুন্দরী নর্তকীর উপর কোন অত্যাচার উৎপীড়ন করা হয়েছে।

নাইট যে সময় হিশামুদ্দিনকে রায়াদীর বর্ণনা শোনাচ্ছিল সে সময় নর্তকী চারজন খৃস্টান প্রহরীর পাহারায় সেখান থেকে বহু দূর চলে গিয়েছিল। সে ছিল ঘোড়ার উপর সওয়ার। উপযুক্ত

চিকিৎসার কারণে তার অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হচ্ছিল।

রাস্তায় সৈন্যদের সে বললো, 'তোমরা আমাকে কায়রো পৌঁছে দাও, আমি তোমাদেরকে আশাতীত মূল্য ও পুরস্কার দেবো।'

কিন্তু সৈন্যরা তার প্রস্তাবে রাজি হলো না। সে একই প্রস্তাব বার বার দিতে থাকলে এক সৈনিক বললো, 'দেখো, তুমি আমাদেরকে প্রলোভন দেখিও না। তুমি তো দেখতেই পাচ্ছো, তোমাকে আমরা কেমন শাহজাদীর মত সসম্মানে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি এতই রূপসী, তোমার দেহে এমন যাদু আছে যে, তুমি যাকে ইশারা করবে সেই তোমার পায়ের তলে এসে জীবন দিতে রাজি হয়ে যাবে।

কিন্তু আমরা তোমার এই লোভনীয় দেহ থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখেছি। কারণ, তুমি আমাদের কাছে আমানত। আর এ আমানত আমাদের সম্রাটের আমানত। আমরা যদি তোমার কথা মেনে নেই অথবা তোমাকে আমাদের সম্পদ মনে করি তবে সম্রাট আমাদের ক্ষমা করবেন না আর ক্রুশও আমাদের ক্ষমা করবে না। তাই তোমার কোন প্রস্তাবই আমরা গ্রহণ করতে পারবো না।'

'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি? আমাদের পরবর্তী ঠিকানা কোথায়?' রায়াদী প্রশ্ন করলো।

'আমরা অনেক দূরের পথে যাত্রা করেছি!' তারা উত্তর দিল, 'এ যাত্রা বড় কঠিন ও দীর্ঘ। সবচে বড় আশংকার বিষয় হলো, আমাদেরকে মুসলমানদের এলাকার ভেতর দিয়ে যেতে হবে।'

এই চারজন খৃস্টান রায়াদীকে সত্যি রাজকুমারীর মতই নিয়ে যাচ্ছিল।

'তুমি অবশ্যই কোন বড় আমীরের মেয়ে অথবা কোন ধনী সওদাগরের কন্যা!' সৈনিকটি বললো, 'তোমার প্রস্তাবটি লোভনীয় অস্বীকার করছি না। বিশ্বাস করি, তুমি যা বলছো তা করতে পারবে। কিন্তু আমরা ক্রুশের আমানত খেয়ানত করতে পারবো না। এই কাফেলায় তোমার সাথে আপনজন আর কে কে ছিল?'

'তোমাদেরকে কেউ বলেনি, আমি একজন পেশাদার নর্তকী?' রায়াদী উত্তর দিল, 'আমার কোন বাবা নেই, কোন ভাই নেই। আমার মা নিজেও একজন নামকরা গায়িকা ও নর্তকী ছিল। আমি বলতে পারবো না, আমি তার কোন প্রেমিকের সন্তান।

মা শিশুকাল থেকেই আমাকে নাচ শিক্ষা দিতে থাকেন। আমারও নাচগান খুব ভাল লাগতো। আমার বয়স যখন ষোল কিংবা সতেরো তখন আমার মা আমাকে এক ধনী লোকের ঘরে পাঠিয়ে দিল।

সে লোকটি ছিল খুবই বুড়ো এবং সে মদ পান করতো। বুড়ো আমাকে বললো, আমাকে পাওয়ার জন্য সে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে। বুড়োর কথা শুনে তার প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা জাগলো। বুড়োকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল, আমার তো কোন পিতা নেই, এই বুড়োই হয়তো আমার বাবা হবে।

বুড়ো যতই আমাকে কাছে টানতে চাইলো ততোই আমার মনে হতে লাগলো, এ লোক আমার বাবাও নয় আর আমার প্রতি তার কোন ভালবাসাও নেই। সে আমার যৌবনের এক বৃদ্ধ ও অচল গ্রাহক মাত্র।

একদিন আমি সেখানে থেকে পালিয়ে এলাম। মাকে যখন ঘটনা বললাম, মা বললো, 'এটা আমাদের পেশা ও জীবিকা।' আমি কিছুতেই তা মেনে নিতে পারলাম না। মা আমাকে পূনরায় তার কাছে ফিরে যেতে বললো, কিন্তু আমি তার সে আদেশ মানতে অস্বীকার করলাম। রেগে গিয়ে মা আমাকে খুব মারপিট করলো। তবু নতি স্বীকার না করে আমি মাকে বললাম, 'আমি নাচবো, গাইবো, কিন্তু কারো শয্যা সঙ্গীনি হবো না।'

অবশেষে মা আমার শর্ত মেনে নিলেন।

ওই লোকের অগাধ ধন সম্পদ ছিল। সে আমাকে নেয়ার জন্য বার বার আমাদের বাড়ীতে আসতে লাগলো। কিন্তু আমি রাজি হলাম না।

যেহেতু আমি বিয়ে করিনি এবং কারো সাথে সম্পর্কও গড়িনি সে জন্য আমার মূল্য বেড়ে গেল। অনেক নামী দামী পুরুষ আমার পেছনে ঘুর ঘুর করতে লাগলো।

এভাবে তিনটি বছর কেটে গেল। এ সময় আমার মনে এক নতুন প্রেরণা ও আবেগ জেগে উঠলো। আমার মনে হলো, আমার নাচ, গান ও সৌন্দর্যের পরিবর্তে, যদি আমাকে কেউ ভালবাসে, তাহলে তেমন লোককে মন দেয়া যায়। আমি মনে

মনে এমন ব্যক্তিকে খুঁজছিলাম। শেষে এমন এক ব্যক্তি ভাগ্যে জুটে গেল।

লোকটিকে দেখে আমার খুব ভাল লেগে গেল। সে আমার চেয়ে সাত আট বছরের বড়। তার সাথে ঘরে বাইরে সবখানেই আমার সাক্ষাত হতে লাগলো। আমি ঘোড়া গাড়ীতে বেড়ানোর নাম করে বেরিয়ে যেতাম। আর সে সেখানে উপস্থিত থাকতো।

আমার চোখে সে ছিল এক রাজকুমার। তার সাথে মিশতে গিয়ে জানতে পারলাম সে মদ পান করে। আমি তাকে নিষেধ করলাম। এক সন্ধ্যায় তাকে বললাম, 'তুমি মদ পান ত্যাগ করো।'

সে রাজি হলো এবং কসম খেয়ে বললো, সে আর মদ পান করবে না। সে তার অঙ্গীকার পূরণ করে দেখালো।

একদিন সে আমাকে বললো, 'তুমি নাচ ছেড়ে দাও।'

আমি তার কথায় রাজি হয়ে গেলাম এবং কসম খেয়ে বললাম, 'ভবিষ্যতে আমি এ পেশাকে অভিশপ্ত মনে করবো। কিন্তু যে পর্যন্ত আমি এ বাড়ীতে থাকবো সে পর্যন্ত এ পেশা ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব না। মা জোর করে আমাকে দিয়ে এ কাজ করাবে। নাচ ছাড়তে হলে আমাকে এ বাড়ী ত্যাগ করতে হবে।'

সে স্বীকার করলো। সে আরো বললো, 'আমিও এক বিলাসী পিতার বিলাস পুত্র। আমার বাবার রং মহলে তোমার চেয়েও ছোট ছোট মেয়েরা আছে। আমিও আমার বাড়ীতে কখনও সৎ থাকতে পারবো না।'

আমি তাকে বললাম, 'আমিও আমার এক নর্তকী মায়ের একমাত্র নাচিয়ে মেয়ে। তোমাকে তোমার বাবার বিলাসিতা যেমন খারাপ করেছে আমাকে খারাপ পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমার মায়ের পেশা। এসো, আমরা কোথাও দূরে পালিয়ে যাই এবং স্বামী স্ত্রীর মতো পবিত্র জীবন যাপন করি।'

আমরা দু'জনেই এ প্রস্তাবে একমত হলাম।

আমার ধর্ম কি তা আমার জানা ছিল না। যার জন্ম পরিচয় জানা নেই তার আবার ধর্ম কিসের? আমার বাবা মুসলমান, খৃস্টান না ইহুদী ছিল কে বলবে সে কথা? কিন্তু সে ছিল মুসলমান। আমি তাকে বললাম, 'তুমি আমাকে মুসলমান হিসেবেই গণ্য করো আর আমাকে বুঝাও এ ধর্মটা কি?' আমি তাকে আরো বললাম, 'তুমি আমাকে ভালবাসা দাও; আমাকে পবিত্র জীবন দান করো।'

সে আমাকে বুঝালো, 'পবিত্র হতে হলে হেজাযে যেতে হবে। কাবার গিলাফ ধরে তওবা করতে হবে আল্লাহর কাছে।'

আমি নিজেও হেজাযের অনেক গল্প শুনেছি আগে। হেজাযের গান আমার খুব প্রিয় ছিল। আমি অনেক সময় গুন গুন করে একা একাই সে গান গাইতাম। 'চলো কাফেলা হেজায পানে।'

হেজাযের নাম শুনে সেখানে যাওয়ার জন্য আমার আকাংখার আগুন বেড়ে দিল। আমি তাকে বললাম, 'আমি প্রস্তুত! আমি যাবো হেজাযে।'

সে বললো, 'অধৈর্য হয়ো না। সাহস ও ধৈর্য ধারন করো।'

আমি বললাম, 'সাহসের অভাব নেই আমার। তুমি আমার আশা পূরণ করে দাও। এখান থেকে বের করে নাও আমায়।'
সে আমাকে বললো, 'তুমি কি জানো, অন্য কোথাও না গিয়ে কেন আমি হেজায যেতে চাচ্ছি?'
আমি বললাম, 'সে স্থান অতি পবিত্র ও সুন্দর।'
সে বললো, 'শুধু সুন্দরই না, সে স্থান অতি পবিত্র এবং মানুষের নিরাপদ আবাসভূমি। সেখানে পবিত্র কাবাঘর আছে। আছে আবে জমজম কুপের পানি। সেখানে যে যায় তার আত্মা পবিত্র হয়ে যায়।' সে আরও বললো, 'আমরা সেখানে হজ্জব্রত সমাপন করে পবিত্র হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবো এবং সেখানেই থেকে যাবো।'
আমি তার সেই সময়ের স্মৃতি কখনও ভুলতে পারবো না, যখন সে আমার সাথে সরল শিশুর মত কথা বলছিল আর আমি তার চোখে চোখ রেখে তার কথা শুনছিলাম। তার কথাগুলো যেন আমার হৃদয়ে গেঁথে যাচ্ছিল।
আমার তখন মনে হচ্ছিল আমার নিজস্ব অস্তিত্ব বলে কিছু নেই। আমার স্বত্ত্বা তার স্বত্ত্বার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।
আমি তাকে বললাম, 'যদি যেতেই চাও দেরী করে লাভ কি? আগামী কালই চলো।'
সে বললো, 'দাঁড়াও, আমি খোঁজ নিয়ে দেখি কবে কাফেলা যাত্রা করবে।'
পরে এক সন্ধ্যায় সে বললো, 'আজ রাতে প্রস্তুত হয়ে থেকো।

কাফেলা যাত্রা শুরু করেছে। আমরা তাদের সাথে রওনা হতে পারিনি, কারণ আমাদের পরিবার জানতে পারলে আমাদের পথ আটকে দেবে। কাফেলা এগিয়ে যাক, রাতে রওনা হয়ে আমরা দ্রুত ছুটে গিয়ে ওদের সাথে মিলিত হবো।'

আমি তাকে বললাম, 'আমি যদি বাড়ী যাই তবে আমাকে আর আসতে দেবে না। তুমি আমাকে এখনি নিয়ে চলো।'

কিন্তু সে রাজি হলো না। বললো, 'এখন রওনা হলে ধরা পড়ে যাবো। তুমি বাড়ী যাও, রাতে গোপনে বেরিয়ে আসবে। সবাই ঘুমিয়ে গেলে আমিও বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়বো। আমি সংকেত দিলে তুমি বেরিয়ে এসো।'

সে আমাকে নির্দিষ্ট সংকেত শিখিয়ে দিল। বললো, 'আমার আরো কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে। এখন তুমি যাও, নিজেও প্রস্তুতি নাও। প্রয়োজনীয় কাপড় ও সফরের উপযোগী হালকা সরঞ্জাম সঙ্গে নিও।'

আমি বাড়ী ফিরে এলাম। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। আমার বুকের ভেতর কেমন যেন করতে লাগলো। আবেগে ও পুলকে আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। আমার এ অস্থিরতা যেন মায়ের চোখে ধরা না পড়ে সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম।

রাত একটু গভীর হলো। আমার কানে ভেসে এলো সেই নির্দিষ্ট সংকেত। বাতি নিভিয়ে শুয়েছিলাম আমি। সংকেত শুনে সন্তর্পণে নেমে এলাম বিছানা ছেড়ে। আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে নেমে এলাম রাস্তায়।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো সে। আমরা গোপনে বেরিয়ে

পড়লাম কাফেলায় শামিল হওয়ার জন্য।
কিছু দূর আমরা হেঁটে গেলাম। সে এক জায়গায় দুটো ঘোড়া লুকিয়ে রেখে এসেছিল। সেখানে পৌঁছে আমরা দু'জন দুটো ঘোড়ায় আরোহণ করলাম। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতে যা দেরী, পরিচিত লোকালয় থেকে পালানোর জন্য আমরা প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।
পানি, খাবার এবং আসবাবপত্র ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা ছিল। পথে বিশ্রামের জন্য থামলে আমরা সেখান থেকে সামান্য কিছু খেয়ে নিতাম।
পরের দিন সন্ধ্যায় আমরা কাফেলার সাথে গিয়ে মিলিত হলাম। আমাদের যাত্রা ছিল খুবই শান্তিপূর্ণ। নিশ্চিন্তে পথ চলছিলাম আমরা। রাতে বিশ্রামের জন্য যখন থামতো কাফেলা, আমরা আকাশের তারাদের সাথে কথা বলতাম। চাঁদের সাথে কথা বলতাম। আমার রাজপুত্র আমার মনে স্বপ্নের বীজ বুনে যেতো। ভাবতাম, আহা! পৃথিবী এত সুন্দর!
সে রাতেও আমি আমার রাজপুত্রের পবিত্র ভালবাসা বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। কিন্তু আমি কি জানতাম আগামী কালের রক্তলাল সূর্য উঠবে আমাকে রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে নেয়ার জন্য? আমাকে নিঃস্ব ও অসহায় করার জন্য?'
রায়াদী বললো, 'আমার প্রেমিক পুরুষটি তোমাদের হাতে নিহত হলো। আমি আহত হয়ে ধরা পড়লাম তোমাদের হাতে। হেজাযের কাফেলা লুট হয়ে গেল। খানায়ে কাবার মুসাফিররা কাবার দুয়ারে পৌঁছার বদলে পৌঁছে গেল আল্লাহর দরবারে।

আল্লাহ আমার পাপ ক্ষমা করেননি তাই তিনি আমাকে গ্রহণ করেননি। আমার ভাগ্যলিপিতে কাবাঘরে তোয়াফ এবং সিজদাও লিখে রাখেননি। তাই আমার অপবিত্র সত্ত্বা তোমাদের হাতে পড়ে গেল।'

'তুমি যদি ধর্মের মধ্যেই আশ্রয় নিতে চাও তবে আমাদের ধর্মেই আশ্রয় নাও। পবিত্র ক্রুশতো তুমি হাতের কাছেই পাচ্ছো।' এক সিপাই বললো।

'তোমরা আমার এক পবিত্র বাসনা ও ছবি ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছো।' রায়াদী বললো, 'তোমরা যা করেছো এটা কি তোমাদের ধর্ম বৈধ বলে স্বীকার করে? আমি যে স্বপ্ন নিয়ে বের হয়েছিলাম সে স্বপ্ন এতো বিভীষিকাময় ছিল না। যদি কোন ধর্ম এভাবে নির্বিচারে মানুষ খুনকে অনুমোদন করে তবে সে ধর্মে মানুষের কি দরকার?'

'এটা আমাদের ধর্ম নয়, এ ধর্ম আমাদের সম্রাটের।' সিপাই বললো, 'আমরা সেই ব্যক্তির আদেশের চাকর মাত্র।'

'তোমার থেকে তো আমিই তবে উত্তম। আমার পদতলে কত শাহজাদা ও রাজকুমার ধনরত্ন ও তার মাথা নত করে রাখে। কিন্তু আমি এখনো আমার আত্মা ও বিবেককে কারো গোলাম বানাইনি। তোমরা যা করেছো তাতে তোমাদের বিবেক কি সায় দেয়?' রায়াদী বললো, 'মানুষের গোলামী করার চেয়ে নিজের বিবেকের গোলামী করা অনেক ভাল।'

প্রহরী চুপ করে গেল। তার আত্মায় প্রশ্ন জাগলো, 'এ নারী কি অবান্তর প্রশ্ন করেছে? নিরীহ মানুষগুলোকে আমরা কেন খুন

করতে গেলাম? যে শিশুগুলোকে আমরা হত্যা করেছি কি অপরাধ ছিল তাদের?'

প্রহরীকে চুপ থাকতে দেখে রায়াদী বললো, 'তোমরা বিবেকের আদেশ মান্য করো। বিবেকই ধর্ম। যে কাজ তোমার বিবেক সমর্থন করে না তা ধর্ম হতে পারে না।'

'আমরা আমাদের মুনীবের আদেশের তাবেদার।' প্রহরী বললো, 'মুনীবের হুকুমই আমাদের বিবেক, আমাদের ধর্ম।'

'মিথ্যে কথা।' রায়াদী বললো, 'বিবেক অবশ্যই তোমাদের আছে। কিন্তু তাকে সামনে আনতে তোমরা ভয় পাও। আমি সেই ধর্মের অনুসারী যে আমাকে পবিত্র ভালবাসা দান করেছে। যে আমার মনে পবিত্র ধারনা ও বোধ বিশ্বাস দিয়েছে।

আমি আমার আত্মার কাছে প্রশ্ন করে জেনেছি, এটাই সত্য ধর্ম। ধর্ম মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য। পবিত্র ধর্ম কখনো মানুষের অকল্যাণ চাইতে পারে না। এ পবিত্র ধর্মই আমাকে স্বপ্নের দেশ হেজাযের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তোমরা আমাকে সে পথ থেকে ছিনতাই করেছো।'

'তারচে তুমি বলো তোমার ধর্ম তোমাকে ত্যাগ করেছে। সে জন্যই তুমি আমাদের হাতে এসে পড়েছো।' সৈনিক তাকে আরো বললো, 'তোমার আল্লাহ তোমাকে ত্যাগ করেছে। তুমি এখন আমাদের আদেশের তাবেদার। আমরা তোমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে যিনি তোমার মনীব হবেন তিনিই তোমার খোদা। এখন চিন্তা করো সেই খোদাকে কেমন করে খুশী

করবে।'

'না, আমি এখনো আমার আল্লাহর হুকুমের তাবেদার। যদি আমি কোন পূণ্যকর্ম করে থাকি, যদি আমার চিন্তা সঠিক হয় তবে আল্লাহ অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।'

'তাহলে তোমার এ দশা কেন? কেন তুমি আমাদের হাতে বন্দী?'

'এটা আমার পাপের শাস্তি। এ শাস্তি শেষ হলেই আমি আমার আল্লাহর সাহায্য পেয়ে যাবো।'

'কিন্তু আমরা তোমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে তোমাকে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না।'

'যদি না আসে সেটা আমার আল্লাহর দোষ নয়। আমি জানি তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো এবং কেন নিয়ে যাচ্ছো।' রায়াদী বললো, 'আমার স্বত্ত্বা সেখানে আপাদমস্তক পাপে ডুবে যাবে। সেখানে আমার কোন পূণ্য সঞ্চয় করার সুযোগ থাকবে না। তাহলে আমার আল্লাহ আমাকে সাহায্য করতে আসবেন কেন?'

'আমরাও সে কথাই বলি। তুমি তো কোন সৎ চিন্তা করতেই পারো না।' এক সিপাই বললো, 'তুমি পাপের মধ্যে জন্ম নিয়েছো, পাপের মধ্যেই প্রতিপালিত হয়েছো আর এক পাপীর সাথে তুমি বাড়ী থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি পূণ্য ও নেকী কেমন করে কামনা করবে?'

'আমি স্বীকার করি আমি পাপী। কিন্তু যে নিষ্পাপ লোকদের তোমরা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছো তার প্রতিশোধ নিয়ে আমি

পূণ্যবান হয়ে যাবো। আমার মধ্যে যে প্রতিশোধ স্পৃহা টগবগ করছে তাই আমাকে পবিত্র করে দেবে।'

সৈনিকরা এক সাথে জোরে হো হো করে হেসে উঠলো। একজন বললো, 'তোমাকে সম্মানের সাথে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে আমাদের। নইলে প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা আমরা এখনই মিটিয়ে দিতে পারতাম।'

রায়াদী কথা বন্ধ করলো। সে সৈনিকদের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে দেখতে পেলো সেখানে জিঘাংসা কিলবিল করছে। তার মনেও এই বিবেকহীন ডাকাতদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো। রায়াদী কি পারবে তার কাঙ্খিত প্রতিশোধ নিতে? নাকি সেই কতিপয় বর্বর ও অমানুষের প্রতিশোধের শিকার হবে?

পরবর্তী বই ক্রুসেড-২৬

ভণ্ড পীরের কাণ্ড

ক্রুসেড-২৫
দুর্গম পাহাড়
আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশন